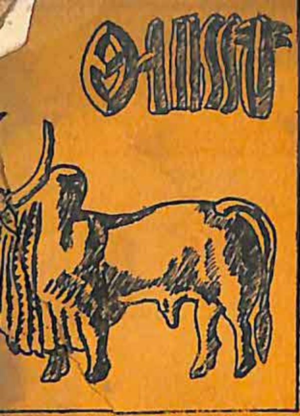






প্রাচীন পৃথিবীর রূপরেখা







Approved by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book of History for Class VI. [Vide Notification No. T. B. No. vi/H/79/107 Dated 5.12.79]

প্রাচীন পৃথিবীর রূপরেখা

[ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য]

সুদর্শন সিংহ
অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজ, বাঁকুড়া

ও

সুধীরাজ মণ্ডল
শিক্ষক, বারাসাত মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল হাই স্কুল ;
ভূতপূর্ব শিক্ষক, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল,
কলিকাতা

S.N.C.
এস, এন, চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

চতুর্থ সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮৪

মূল্য : সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

এস. এন চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রীসুজিত চক্রবর্তী
কর্তৃক প্রকাশিত এবং লক্ষ্মী প্রিন্টার্স ২১/১বি, পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে শ্রীগণেশ কুমার ভাণ্ডারী কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

কবে কি ঘটেছিল

পণ্ডিতদের ধারণা, আজ থেকে তিন লক্ষ (মতান্তরে পাঁচ লক্ষ) বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়। মানুষ সেদিন ছিল অসহায়। পাথর ছিল তার একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু মানুষ চিরকাল প্রকৃতির হাতে অসহায় থাকে নি। প্রয়োজনের তাগিদে বুদ্ধি খাটিয়ে সে ধীরে ধীরে শিখল চাষবাস, পোষ মানাল বনের অনেক পশুকে, তৈরি করল ঘর, শীততাপের হাত থেকে বাঁচার জন্য বয়ন করল বস্ত্র।



পুরাণ প্রস্তর যুগের অস্ত্র

আবিষ্কার করল কুমোরের চাক, তা দিয়ে তৈরি করল নানা ধরনের বাসনপত্র। জিনিসপত্র রাখার অসুবিধে দূর হল। কুমোরের চাকের ঘোরা দেখে মানুষ বের করল চাকা। চাকার উপরে হালকা কাঠ জুড়ে বানাল গাড়ি। তারপর গৃহপালিত জন্তুকে দিয়ে টানাল গাড়ি।



নতুন প্রস্তর যুগের চিত্রিত মাটির পাত্র

ইতিমধ্যে ধাতুর আবিষ্কার হল। বনজঙ্গল পরিষ্কার করে মানুষ নদীর ধারে তৈরি করল বসতি। উদ্ভব হল শহরের। এবার সামাজিক জীবনেও এল পরিবর্তন। সমাজে দেখা দিল ধনী-দরিদ্র। গোষ্ঠীপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হল ক্ষমতা। ধীরে ধীরে এল রাজা ও রাজবংশ। শুরু হল ঐতিহাসিক যুগ। কালানুক্রমিকভাবে তারপরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ঘটল এভাবে :

সুমেরীয় সভ্যতা	...	৩৬০০ খ্রীঃ পূঃ
মিশরের প্রথম রাজবংশ	...	৩৫০০ ,,
পিরামিড যুগ	...	৩১০৪—২৯৬৫ খ্রীঃ পূঃ

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা ...	৩০০০	খ্রীঃ পূঃ (৩৯০০ ?)
ব্যাবিলনরাজ হামুরাবি ...	২১২৩—২০৮১	,,
হিকসস অধিকারে মিশর ...	১৮০০—১৬০০	,,
ইহুদীদের প্যালেস্টাইন আগমন ...	১৮০০	,,
চীনের ইন্ রাজবংশ ...	১৭৬৭—১১২৩	,,
তৃতীয় থুত্মোস ...	১৭৬৬—১৭২৩	,,
হেলেনীয়দের গ্রীসে আগমন ...	১৫০০	,,
দ্বিতীয় রামেসিস ...	১৩০০—১২৩৩	,,
চীনের চৌ রাজবংশ ...	১১২২— ২৫৫	,,
হোমার ...	১০০০	,,
রোম নগর স্থাপন ...	৭৫৩	,,
ইরাণের জরথুষ্ট্র ...	৬৬০— ৫৮৩	,, (?)
ব্যাবিলনরাজ দ্বিতীয় নেবুকাডনেজার	৬০৫— ৫৬২	,,
মহাবীর ...	৫৯৯— ৫২৭	,,
বুদ্ধদেব ...	৫৬৩— ৪৮৩	,,
প্রথম দরায়ুস ...	৫২১— ৪৮৫	,,
পেরিক্লিসের যুগ ...	৪৬১— ৪২৯	,,
আলেকজান্দারের জন্ম ও মৃত্যু ...	৩৫৫— ৩২৩	,,
আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ ...	৩২৭	,,
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ...	৩২২— ২৯৮	,,
ভারতে মেগাস্থিনিস ...	৩০২— ২৯৮	,,
অশোক ...	২৭৩— ২৩২	,,
প্রথম পিউনিক যুদ্ধ ...	২৬৪— ২৪১	,,
চিন্ রাজবংশ ...	২৪৫— ২০৬	,,
দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ ...	২১৮— ২০১	,,
হানিবলের আল্পস অতিক্রম ...	২১৮	,,
তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ ...	১৪৯— ১৪৬	,,
জুলিয়াস সীজারের জন্ম ও মৃত্যু ...	১০০— ৪৪	,,
প্রথম রোম সম্রাট অক্টেভিয়াস ...	২৭ খ্রীঃ পূঃ—১৪ খ্রীষ্টাব্দ	
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ...	৩২০— ৩৩০	,,
সমুদ্রগুপ্ত ...	৩৩০— ৩৮০	,,
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ...	৩৮০— ৪১৩	,,
ভারতে ফা-হিয়েন ...	৩৯৯— ৪০৪	,,

প্রাচীন পৃথিবীর রূপরেখা

প্রথম অধ্যায়

আমরা ইতিহাস পড়ব কেন ?

'ইতিহাস' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল : 'এইরূপ ছিল'। অর্থাৎ, প্রাচীনকালের মানুষ কেমন ছিল, তাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল, তারা কেমনভাবে আমোদ-প্রমোদ করত, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি কেমন ছিল,—এসব বিষয়ই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সাধারণ গল্পের সঙ্গে ইতিহাসের গল্পের একটা বিষয়ে অমিল আছে। সাধারণ গল্পের মধ্যে সত্যের চেয়ে কল্পনার প্রাধান্য বেশি, কিন্তু ইতিহাসের গল্পের মধ্যে সত্যই প্রধান।

আগে ইতিহাস বলতে বোঝাত কেবলমাত্র রাজারাজড়াদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী। কিন্তু ইতিহাস মানে তা নয়। কারণ রাজারাজড়ারা ছাড়া যে অগণিত জনসাধারণ—যারা সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে, তাদের কথাও বিশেষ-ভাবে জানতে হবে। যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীর সঙ্গে শান্তির কাহিনী, রাজা-রাজড়াদের আমোদ-প্রমোদের কাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীও ইতিহাসের মধ্যে না এলে ইতিহাসের গল্প হয়ে পড়বে একঘেয়ে। তাই ইতিহাস রাজাদের বা ক্ষমতাশালী কয়েকটি লোকের জীবনী নয়—ইতিহাস হল মানুষকে নিয়ে। আদিম স্তর থেকে ধারাবাহিক চেষ্টা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা আজকের সভ্যতায় এসে পৌঁছেছি। মানুষের সমাজের এই ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির কাহিনীই হল ইতিহাস।

কেউ যদি এই ইতিহাস খুব ভালো করে পড়েন, তাহলে শুধুমাত্র অতীতের কথাই নয়, মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটা ধারণা করতে পারবেন। বহু মনীষী ব্যক্তি ইতিহাস ভালো করে জেনে মানুষের

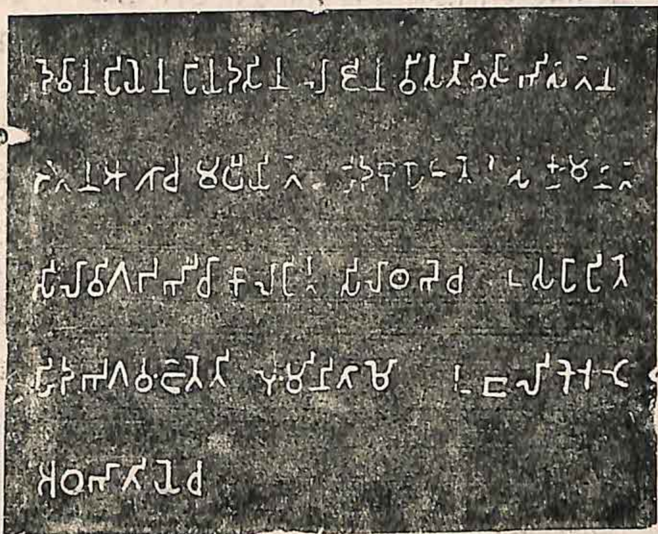
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলেও গেছেন। কাজেই ইতিহাস পড়লে একদিকে যেমন আমরা অতীতের কথা জানতে পারব, তেমনি ভবিষ্যতে আমরা কোন্ দিকে চলেছি, সে সম্পর্কেও একটা ইঙ্গিত পেতে পারব। এজন্য সকলেরই নিষ্ঠা নিয়ে ইতিহাস পাঠ করা উচিত।

আদিম কালের কথা কি করে জানা গেল ঃ হাজার হাজার বছর আগে মানুষ কি করত, কোথায় থাকত, কি খেত, কেমন করে আস্তে আস্তে সভ্য হল, এসব কথা কেমন করে জানা গেল? মানুষের সভ্যতার এই প্রথম যুগের ইতিহাস পণ্ডিতদের বহু চেষ্টা ও সাধনার ফলে আমরা জানতে পেরেছি। অবশ্য সব কথা এখনও জানা যায়নি, কারণ প্রমাণের অভাব, কিংবা প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। আবার যে-সব চিহ্ন বা প্রমাণ ছিল, তাও হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে। কোন্ কোন্ জিনিসের মাধ্যমে প্রাচীনকালের কথা আমরা জেনেছি, তা নিচে বলছি ঃ

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ঃ পণ্ডিতেরা অনেক পরিশ্রম করে বহু তথ্য প্রমাণ আবিষ্কার করে নীরব ইতিহাসকে কথা বলালেন। মাটির স্তূপ দেখে আন্দাজ করলেন, এখানে হয়ত প্রাচীন কালের চিহ্ন আছে। তারপর মাটি খুঁড়ে নানা রকমের পাথরের যন্ত্রপাতি, ধাতুর তৈরি জিনিস, মাটির খেলনা, বাসনপত্র—এমন কি প্রাচীন যুগের মানুষের ব্যবহৃত অলঙ্কারও বের করলেন। আবার কোথাও বা মানুষের হাড় ও মাথার খুলি পাওয়া গেল, কোথাও বা গুহার দেয়ালে আঁকা নানারকম ছবির সন্ধান পাওয়া গেল, আবার কোনও কোনও জায়গা খুঁড়ে অতি প্রাচীন কোনও শহরের চিহ্ন পাওয়া গেল, ভাঙ্গা মন্দির, প্রাসাদ-ঘর-দুয়ার ও কবর বের হল। এই সমস্ত জিনিসপত্রের সাহায্যে পণ্ডিতেরা বহু প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনা করার চেষ্টা করলেন।

প্রাচীন লিপি ঃ প্রাচীন যুগের রাজারা তাঁদের যুদ্ধ-বিজয় বা অভিষেকের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য পাথরের ফলকে, শিলা-স্তম্ভে, পাহাড়ের গায়ে অথবা ধাতুর পাতে নিজেদের কীর্তিকাহিনী লিখে রাখতেন। পাহাড় বা পাথরের গায়ে খোদাই-করা লিপিকে শিলালিপি বলা হয়। সম্রাট অশোকের এইরকম অনেক শিলালিপি আছে। এইসব শিলালিপি থেকে তাঁর জীবন, উপদেশ ও রাজ্যশাসনের অনেক

খবর জানা যায়। পাথর বা মাটির ফলকের উপর লেখা পাওয়া গেছে ব্যাবিলনে, পশুচর্মের উপর লেখা পাওয়া গেছে আরবে এবং প্যাপিরাস



অশোকের শিলালিপি

গাছের ছালের উপর লেখা পাওয়া গেছে মিশরে। এগুলি ওসব দেশের ইতিহাস জানতে সাহায্য করেছে।

মুদ্রা ঃ শুধু লিপি নয়, নানা স্থানে প্রাচীন যুগের অনেক মুদ্রা বা টাকা-পয়সা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মুদ্রাগুলোর উপর নাম, সাল, রাজার মূর্তি কিংবা অন্য কিছু লেখা থাকত। এইসব ছাপ দেখে কোন্ বংশের রাজা, কখন রাজত্ব করতেন,—তা বোঝা যায়। আবার কোনও কোনও মুদ্রায় দেব-দেবীর ছবি আঁকা থাকত। এগুলো দেখে সেই যুগের মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদির বিষয়ও জানা যায়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রাপ্ত মুদ্রা থেকে ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক ও কুষাণ জাতির ইতিহাস সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ও সাহিত্য ঃ বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকেও প্রাচীন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্ম ও সভ্যতা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মূল্যবান তথ্য জানা যায়। মানুষ যখন থেকে ভাষা

শিখেছে, তখন থেকেই মনের ভাব প্রকাশের জন্য লিখবার আয়োজন করেছে। মিশরে প্যাপিরাস, আমাদের দেশে ভুর্জপত্র, ব্যাবিলনে মাটির টালি—এই সমস্ত উপাদানের উপর নানা পুঁথি লেখা হয়েছে। সে-সব পুঁথির কিছু কিছু এখনও আছে। এই সমস্ত প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে সেই যুগের মানুষের সম্বন্ধে বহু বিষয় আমরা জানতে পারি।

প্রাচীন গ্রীসের কবি হোমারের ইলিয়ড ও ওডিসি, আমাদের বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলি এবং প্রাচীন যুগের পরিব্রাজক—যেমন ফা-হিয়েন, হিউ-এন্-সাঙ্ প্রভৃতির ভ্রমণ কাহিনীও প্রাচীন ইতিহাস রচনার চমৎকার উপাদান।

অনুশীলনী

১। 'ইতিহাস' শব্দটির অর্থ কি? কেন আমরা ইতিহাস পড়ব?

২। প্রাচীন যুগের মানুষের ইতিহাস কি কি উপায়ে জানা যায়?

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) পাথরের গায়ে খোদাই-করা লিপিকে—বলে।

(খ) মাটির ফলকের উপর লেখা পাওয়া গেছে—।

(গ) ইলিয়ড ও ওডিসি মহাকাব্য দুটির রচয়িতা —।

(ঘ) প্রাচীন মুদ্রায় — লেখা থাকত এবং — আঁকা থাকত।

(ঙ) আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলির নাম —।

(চ) — দুজন প্রসিদ্ধ প্রাচীন পরিব্রাজক।

৪। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ**

(ক) ইতিহাস বলতে কি বোঝায়?

(খ) প্রাচীন শিলালিপি থেকে কি জানা যায়?

(গ) ফা-হিয়েন ও হিউ-এন্-সাঙ্-এর ভ্রমণ কাহিনী আমরা পড়ব কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদিম মানুষ

মানুষ কেমন করে পৃথিবীতে এল, তা ঠিক করে বলা শক্ত। পণ্ডিতেরা মনে করেন, তিন থেকে পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষের উৎপত্তি হয়। খুব সম্ভব শিম্পাঞ্জি বা ওরাং-ওটাং জাতীয় জীব থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়। আধুনিক মানুষের সঙ্গে প্রাচীন যুগের এই বানর জাতীয় মানুষের অনেক তফাত। ১৯২০ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীন দেশে 'প্রায় মানুষের' অনেকগুলি নমুনা পাওয়া যায়। তার প্রথমটা বেরিয়েছিল পিকিং শহরের চাও-কাও-তিয়েন গুহা থেকে। তা থেকে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পিকিং-মানব'। অনুমান করা যায় যে, এরা দেড় লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল। এদের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের গঠনের মিল আছে। জার্মানিতে নিয়াণ্ডারথ্যাল নামক স্থান থেকে যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তা থেকে মানুষের প্রথম চেহারা বোঝা যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে নিয়াণ্ডার-থ্যাল মানুষের জন্ম হয়। এরও পঁচিশ হাজার বছর পরে পৃথিবীতে ক্রোম্যাগনন মানুষের জন্ম হয়। এই মানুষের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায় ফ্রান্সের ক্রোম্যাগনন প্রদেশে।



নিয়াণ্ডারথ্যাল মানুষ



ক্রোম্যাগনন মানুষ

আগুনের আবিষ্কার: আদিম মানুষ দেখতে ছিল বনমানুষের মত। খাবার আর আশ্রয়ের খোঁজে তারা বন্য জন্তুদের মত বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত; হিংস্র জন্তু দেখলে পালাত। এইভাবে

হাজার হাজার বছর কাটাবার পর মানুষ আগুন আবিষ্কার করল। যেদিন মানুষ আগুন আবিষ্কার করল, সেদিন থেকেই বলতে গেলে সভ্যতার সার্থক অগ্রগতির সূত্রপাত হল। প্রথমে মানুষ আগুনকে এত ভয় করত যে, বজ্রপাতের সময় অথবা বনে দাবানল জ্বললে তারা প্রাণপণে ছুটে পালাত।

প্রথমে হাতিয়ার তৈরি করার সময় থেকেই মানুষের মন থেকে ধীরে ধীরে আগুনের ভয় কেটে গেল। সম্ভবতঃ পাথরে পাথর ঘষতে গিয়ে, অথবা কাঠে কাঠে ঘষার জন্য আগুনের ফুলকি দেখতে পেয়েছিল তারা এবং তাই দেখেই আস্তে আস্তে আগুন সম্পর্কে তাদের ভয়ের ভাব



আদিম মানুষের আগুন জ্বালানো

কেটে গিয়েছিল। এরপর ক্রমে ক্রমে মানুষ কাঁচা মাংসের বদলে মাংস আগুনে ঝলসিয়ে অথবা পুড়িয়ে খেতে শিখল। শুধু তাই নয়, জন্তু-জানোয়ারের ফাঁপা মাথার খুলিতে চর্বি জমিয়ে তাতে শ্যাওলার পলতে ডুবিয়ে প্রদীপ জ্বালাবার ব্যবস্থা করল। অন্ধকার রাতে গুহায় শুয়ে তারা এই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখত, অথবা শুকনো কাঠ-কুটোতে আগুন জ্বালিয়ে রাখত। হিংস্র জীবজন্তুরা ঐ আগুন দেখে ভয়ে ঐদিকে আসতে সাহস পেত না। এইভাবে আগুনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জন্তু-জানোয়ারের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়ল।

খাদ্য সংগ্রহ ঃ এই প্রাচীন মানুষেরা ফল, গাছের পাতা, ছোট

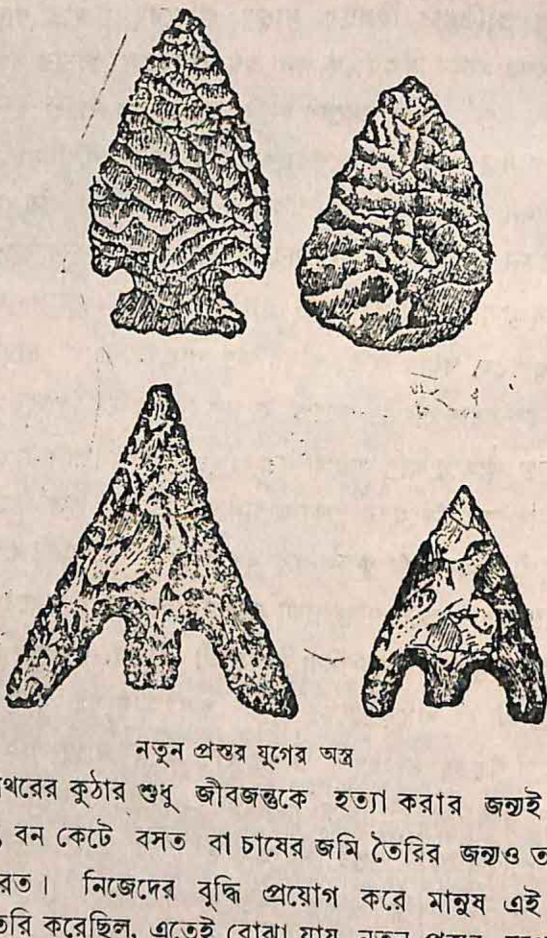
ছোট জন্তু-জানোয়ার সবই খেত। প্রায় সব কিছুই খেত বলে অনেকে এদের 'সর্বভুক' বলে আখ্যা দিয়েছেন। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এমন সব প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন যাতে বেশ বোঝা যায়—সে যুগের মানুষ খাদ্য সংগ্রহ করত দল বেঁধে।

পুরাতন প্রস্তর যুগ ঃ আদিম যুগে মানুষ কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত, তা দেখে আমরা মানুষের সভ্যতাকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি। তার প্রথমটাকে বলা হয় প্রস্তর যুগ। কারণ, এই যুগে হাতিয়ার হিসাবে মানুষ পাথরের টুকরো ব্যবহার করত। প্রস্তর যুগের প্রথম দিকটাকে বলা হয় **পুরাতন প্রস্তর যুগ**।

মানুষ কবে থেকে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার আরম্ভ করে, তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, নিয়াণ্ডারথ্যাল এবং ক্রোম্যাগনন মানুষরাই প্রথম পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার আরম্ভ করে।

পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের ব্যবহার-করা যে-সব যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে, সেগুলো তেমন ঘষামাজা ছিল না। কিন্তু ক্রমে গুহাবাসী মানুষ লক্ষ্য করল যে, ঘষাঘষিতে পাথর ক্ষয় পায়। ফলে তারা পাথর ঘষে পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে লাগল। প্রথমে তারা এক টুকরো পাথর অন্য পাথরে ঘষে ধারাল করত। তারপর গাছের লম্বা ডাল ভেঙ্গে তার মাথায় লতা দিয়ে ঐ ধারাল পাথরের টুকরো শক্ত করে বেঁধে নিয়ে বানাত বর্শা, বল্লম আর কুড়ুল-এর মত অস্ত্র। এইবার এই অস্ত্র হাতে নিয়ে মানুষ তার চেয়ে শক্তিশালী জীবজন্তুদের হত্যা করতে সক্ষম হল। ফলে আদিম যুগের প্রায়-নিরামিষভোজী মানুষ এ যুগে হল দস্তুরমত আমিষভোজী। জানোয়ারের মাংস হল মানুষের খাদ্য, আর তাদের চামড়া হল শীতের আবরণ। জন্তুর হাড় দিয়ে মানুষ সূচ বানাল, আর সেই সূচে সরু চামড়া পরিয়ে দরকারমত পশুর চামড়া সেলাই করে নিল। হাতির দাঁত, পশুর শিং প্রভৃতি দিয়ে তারা নানা ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতে শিখেছিল। এসব জিনিসগুলো তারা পশুশিকারে, আত্মরক্ষায় ও নিজেদের ঘরের কাজের জন্য ব্যবহার করত। লাঠির আগাকে সূচালো করে তাকে তীরের মত ব্যবহার করতেও শিখেছিল তারা।

নতুন প্রস্তর যুগ ঃ পুরাতন প্রস্তর যুগের হাতিয়ারগুলো দেখতে বিশেষ সুন্দর বা মসৃণ ছিল না। ক্রমে ক্রমে মানুষ পাথরের অস্ত্রগুলোকে আরও সুন্দর, মসৃণ এবং ধারাল করতে শিখল। এভাবে নতুন প্রস্তর যুগ এসে পড়ল। তীরধনুকও ব্যবহার করতে শিখেছিল তারা। পাথর ঘষেমেজে ছুরি, কুড়ুল জাতীয় তীক্ষ্ণ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করল। এর সবটাই যে বাঁচার জন্য অস্ত্র হিসেবে তারা ব্যবহার করতো তা নয়, জীবনের অন্যান্য কাজেও এগুলো ব্যবহৃত হোতো। যেমন, কাঠের হাতল



নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত্র

লাগানো পাথরের কুঠার শুধু জীবজন্তুকে হত্যা করার জন্যই ব্যবহৃত হোতো না, বন কেটে বসত বা চাষের জমি তৈরির জন্যও তারা এসব ব্যবহার করত। নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষ এই যে সব যন্ত্রপাতি তৈরি করেছিল, এতেই বোঝা যায়, নতুন প্রস্তর যুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অনেকটা বিকাশ ঘটেছিল।

এই সময়ের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল জমি চাষ করা। এতদিন মানুষ তার চারপাশের গাছপালা থেকে ফল, পাতা আর শেকড়

সংগ্রহ করে খেত। কিন্তু এবার মানুষ লক্ষ্য করে দেখল যে, বীজ থেকে গাছ হয়। তাই তারা নিজের সুবিধেমত জায়গায় বীজ পুঁতে চাষবাস আরম্ভ করল, জীবজন্তু পুষতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মানুষ তাদের মাংস ও দুধ খেতে লাগল। এই দুটো আবিষ্কারের ফলে মানুষকে আর খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হল না। মানুষ এক জায়গায় ঘর বেঁধে বাস করতে শিখল। তারা নতুন নতুন শস্যের চাষ করতে লাগল এবং তা রান্না করে খাবার কৌশলও আবিষ্কার করল। অবশ্য নতুন প্রস্তর যুগের লোকেরা তখনও ধাতুর অস্ত্র আবিষ্কার করতে পারে নি। পাথরের যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রই তারা ব্যবহার করত।

নতুন প্রস্তর যুগে বিরাট পরিবর্তন ঃ নতুন প্রস্তর যুগ প্রকৃতপক্ষে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিপ্লব বিশেষ। কৃষিকাজের কৌশল এবং পাথরের মসৃণ যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের কৌশলটি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর আক্রমণ এবং প্রকৃতির রুদ্ররোষের কাছে মানুষ একেবারে অসহায় রইল না, নিজেকে অন্ততঃ খানিকটা বাঁচাতে শিখল। এ সময়ে মানুষের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বগুলি হল ঃ

গৃহপালিত জন্তুর উদ্ভব ঃ কৃষিকর্ম আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ বনের পশুপাখিকে ক্রমশঃ পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগাতে লাগল। সম্ভবতঃ মানুষের প্রথম পোষ মানানো জন্তু হল কুকুর। পাথরের হাতিয়ার হাতে শিকারে বেরিয়ে মানুষ একদিন বনের মধ্যে কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেল। বাচ্চাগুলোকে না মেরে মানুষ তাদের সঙ্গে করে নিয়ে এল, তারপর তারা খুব সহজেই মানুষের পোষ মানল এবং শিকার করার কাজে তাকে সাহায্য করতে লাগল। পরে তারা অন্যান্য পশুর বাচ্চাদেরও পোষ মানাল।

মাটির পাত্র ও চাক আবিষ্কার ঃ আজকাল আমরা নানা প্রকারের মাটির তৈরি জিনিস—যেমন হাঁড়ি, কলসি, ভাঁড় ইত্যাদি ব্যবহার করি। কিন্তু আদিমযুগে এসব কিছুই ছিল না। মানুষ যতই সভ্য হতে লাগল, ততই সে বিভিন্ন রকমের বাসনপত্রের অভাব অনুভব করতে লাগল। একেবারে আদিম মানুষ পিপাসা পেলে দু' হাতের আঁজলা ভরে জল খেত। চাষ-আবাদ করার কৌশল আবিষ্কারের পর থেকে

খাবার যোগাড়ের ভাবনা কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ পেল প্রচুর অবসর। এই অবসরে প্রয়োজনের তাগিদে মাথা খাটিয়ে তারা মাটি দিয়ে হাঁড়ি-কলসি বানাতে শিখল। কাদামাটির তাল পাকিয়ে আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে তারা নানা রকমের পাত্র তৈরি করল, পরে সেগুলোকে রোদে শুকিয়ে নিল। কিন্তু মাটির পাত্রে জল রাখলে তা গলে যায়। তখন মানুষ দেখল মাটির পাত্র আগুনে পুড়িয়ে নিলে বেশ শক্ত হয় এবং জল লাগালে তা গলে না। এভাবে মাটির পাত্র তৈরি করে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মানুষ তার পাত্রের অভাব মেটাল।

কিন্তু হাতে-গড়া জিনিসগুলো এবড়ো-থেবড়ো হোতো। কি করে এগুলিকে আরও সুন্দর করা যায়—এ চিন্তা মানুষের মাথায় জাগল। চিন্তার ফলে ফন্দিও বেরুল। পালিশ-করা গোলাকার পাথরের তাল এ-কাজে বেশ উপযোগী বলে বিবেচিত হল। ফলে তৈরি হল কুমোরের চাক।

বস্ত্র তৈরি ঃ নতুন প্রস্তর যুগের লোকেরা নানা বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি করলেও বস্ত্রনির্মাণে তারা তেমন দক্ষতা দেখাতে পারে নি। বেশির ভাগ সময়েই তারা চামড়ার পোশাক পরত। তবে, সুইজারল্যাণ্ডে হ্রদের জলে এ সময় একদল মানুষ বাস করত। তারা এ যুগের অন্যান্য মানুষের তুলনায় সভ্য ছিল। তারা মাটির টেকোয় শণের সুতো কাটতে পারত। সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করত তারা। শণের সুতোয় জাল তৈরি করে তারা মাছও ধরত।

আদিম মানুষের ঘর ঃ আদিম মানুষের বাসস্থান ছিল পাহাড়ের গুহা-গহ্বরে। পাহাড়ের গুহায় ঘাস-পাতার বিছানায় আদিম মানুষ রাত কাটাত। যদিও তখন তারা আগুন আবিষ্কার করতে পারে নি, তবুও পাহাড়ের গুহায় রাতে বন্য পশুর আক্রমণের ভয় ছিল অনেক কম। বহু বছর এভাবে গুহায় বসবাস করার পর মানুষ ক্রমে ক্রমে নিজের ঘর-বাড়ি তৈরি করতে শিখল। সে-যুগের মানুষেরা আর একরকম নিরাপদ বাসস্থানের সন্ধান পেয়েছিল। অগভীর হ্রদের মাঝখানে খুঁটি পুঁতে তার উপর মাচা তৈরি করেও তারা বসবাস করত। ডাঙার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য গাছের গুড়ি দিয়ে তারা নৌকোও বানাতে শিখল।

প্রয়োজনের তাগিদে গুহামানবকে নতুন বাসস্থান বানাতে হল; কারণ ইতিমধ্যে মানুষ পশুপালন করতে আরম্ভ করেছে। এই গৃহ-পালিত পশুদের জন্য ঘাসের প্রয়োজন। সেইজন্য এক জায়গায় ঘাস শেষ হয়ে গেলে তাকে অন্য জায়গায় পশুদের নিয়ে যেতে হত; তাই কোনও গুহায় স্থায়িভাবে বসবাস করায় অসুবিধে হচ্ছিল। এবার প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ নতুন ধরনের বাসগৃহ তৈরি করল; প্রাচীন যুগের এই বাড়িগুলো ছিল গোলাকার এবং ঘরের কাঠামো সাধারণতঃ নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ দিয়ে তৈরি করা হোতো। তারপর মোটা করে কাদার প্রলেপ দেওয়া হোতো। তারপর পাথরের টুকরো সাজিয়ে ঘরের চারদিকে প্রাচীরের মত করা হোতো। প্রাচীরের একধারে থাকত বাইরে যাবার পথ। এই পথের পাশে একধারে থাকত আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা।

প্রাচীন পরিবহণ ব্যবস্থা ঃ পরিবহণের জন্য মানুষ প্রথম ব্যবহার করত মেয়েদের। তারপর তারা এ কাজে পশুদের ব্যবহার করতে শেখে। পশুদের মধ্যে প্রথমে কাজে লাগানো হয় কুকুরকে, তারপর গরুকে। প্রস্তর যুগে গৃহপালিত ষাঁড়কে পরিবহনের কাজে লাগানো হয়। বলদে টানা গাড়ির ব্যবহার আজও আছে। এরপর মানুষ গাধা, ঘোড়া, হাতি প্রভৃতি জন্তুদেরও পরিবহণের কাজে ব্যবহার করতে শেখে।

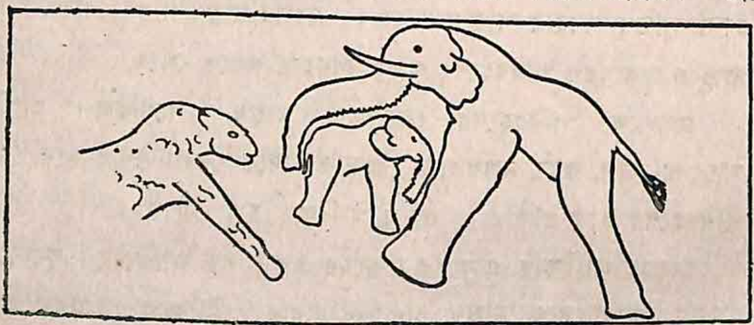
জলপথে পরিবহণের কৌশলও মানুষ শিখেছিল। আদিম মানুষেরা ঘাস, কাঠ, নলখাগড়া প্রভৃতি দিয়ে ভেলা তৈরি করে তাতে পরিবহণের কাজ চালাত। ক্রমে আবিষ্কৃত হল নৌকো।

চাকার আবিষ্কার এ-যুগের মানুষের একটা বড় আবিষ্কার। কুমোরের চাকের ঘোরা দেখে মানুষ চাকা বানাবার চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম গাছের গুঁড়িকে চাকার মত ব্যবহার করার চেষ্টা হয়। তারপর ক্রমে তাদের হাল্কা করবার জন্য আজকালকার মত স্পোকওয়ালা চাকার আবিষ্কার হয়। এই চাকা আবিষ্কারের পর মানুষ মাথা খাটিয়ে এই চাকার উপর হালকা কাঠ জুড়ে বানাল গাড়ি এবং এই গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিল গাধা, ঘোড়া, গরু ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুকে। এরাই গাড়ি টানতে লাগল।

সমাজের উদ্ভব ঃ আদিম মানুষ কাঁচা মাংস এবং ফল-মূল খেয়েই

জীবন-ধারণ করত। তখন তারা ছোট ছোট পরিবারে দল বেঁধে খাদ্য সংগ্রহ করত। পরিবারে বাবাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তার নির্দেশ মেনেই মা এবং ছেলেমেয়েরা চলত। কিন্তু এই ছোট ছোট পরিবারের পক্ষে সব সময় খাদ্য সংগ্রহ করা বা হিংস্র জন্তুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব হোতো না। তাই কয়েকটা পরিবার একত্রিত হয়ে এক-একটা গোষ্ঠী গঠন করল এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বলবান এবং বুদ্ধিমান, তাকে গোষ্ঠীর নেতা করা হল। এই গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাতে ভালভাবে চলে, সেইজন্য অবশ্যই কিছু কিছু নিয়ম-কানুন তৈরি করা হল। এইভাবে অপরিণত এক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হল। একে আমরা বর্তমানের উন্নত শাসন-ব্যবস্থা বা সরকারের আদিমতম রূপ বলে মনে করতে পারি। কৃষিকর্মের উদ্ভব হওয়ার পর এইসব জনগোষ্ঠী তাদের সুবিধামত স্থানে স্থায়িভাবে বাস করতে শুরু করল।

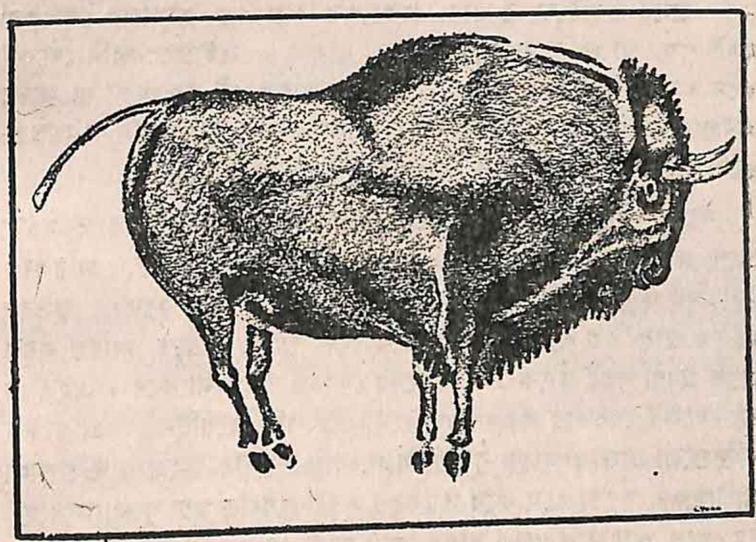
শিল্পের বিকাশ ঃ আদিম মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করার পর থেকেই তার জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো—যেমন, খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান—অনেক সহজেই সংগ্রহ করতে লাগল। তাই



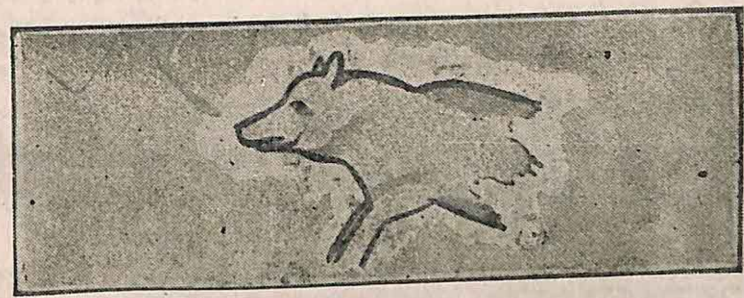
প্রাচীন গুহাচিত্র

এরপর থেকে মানুষের সৌন্দর্যবোধও জেগে উঠল। তারা তাদের বাসস্থানকে এবং নিত্যব্যবহৃত জিনিসপত্রকে আরও সুন্দর করবার চেষ্টা করতে লাগল। তারা মাটির পাত্রের গায়ে ছবি আঁকল, গায়ে গয়না পরতে আরম্ভ করল। প্রাচীন মানুষ গয়না তৈরি করত মাটি পুড়িয়ে এবং পরে ধাতু দিয়ে। ক্রমে এইসব গয়নার উপর নানারকম ছবি খোদাই করে সেগুলোকে আরও সুন্দর করবার চেষ্টা করল। প্রাচীন গুহাবাসী মানুষেরা

গুহার দেয়ালে আঁকল জীব-জন্তুর ছবি। এইসব গুহাচিত্রগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গুহার গায়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউরোপে ফ্রান্সের দক্ষিণে আর স্পেনের উত্তর দিকে পাহাড়ের মধ্যে এরকম অনেক গুহা



স্পেনের আলতামিরার গুহাচিত্র



ফ্রান্সের ফন্‌-স্ত-গম গুহার দেয়ালে প্রস্তর যুগের শিল্পীর আঁকা নেকড়ের ছবি। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০ বছরের পুরনো।

আছে। আলতামিরা নামক একটা জায়গায় গুহার দেয়ালে ও ছাদে এইরকম অনেক সুন্দর সুন্দর রঙিন ছবি আঁকা আছে। এর প্রাচীরগাত্রে রয়েছে ঘোড়া, হরিণ, ষাঁড় প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর ছবি।

ভাষা ঃ মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলে, তাদের পরস্পরের মনের কথা প্রকাশ করবার প্রয়োজন হল। মানুষ প্রথমে

বনের পশুর মত কতকগুলো শব্দ করত। যেমন—ভয় পেলে চিৎকার করত, আনন্দ হলে হাসত, অথবা হাত নেড়ে ইশারা করেও নানা রকমে মনের ভাব প্রকাশ করত। এই সময় মানুষের কোন ভাষা ছিল না। ক্রমে একই মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক সমাজের লোকেরা একই শব্দ বা ধ্বনি ব্যবহার করতে থাকল। এইভাবে ধ্বনি থেকেই ক্রমে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল। ক্রমশঃ মানুষ এই শব্দগুলো বা মনের ভাবগুলোকে এঁকে দেখাতে আরম্ভ করল। এই আঁকা ছবি বা সঙ্কেত-গুলো থেকেই পরবর্তীকালে অক্ষরের সৃষ্টি হয়েছিল।

ধর্মের উদ্ভব ঃ প্রাচীন যুগের মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির ভয়ঙ্করতা দেখে ভীত ও বিস্মিত হত। জলপ্লাবন, ঝড়, বজ্রপাত, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির কাছে মানুষ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করত। সুতরাং এইসব প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ভয়ে ভয়ে পূজো করতে আরম্ভ করল যাতে তারা সন্তুষ্ট থাকে এবং মানুষের কোনও ক্ষতি না করে। এইভাবে ভয় থেকেই দেবতার কল্পনা এবং ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল। প্রাকৃতিক শক্তিগুলো ছাড়াও মানুষ কুমীর, সাপ, বাঘ ইত্যাদি হিংস্র ও শক্তিশালী প্রাণীদেরও দেবতা মনে করে তাদেরও সন্তুষ্ট রাখবার জন্য পূজো করেছে। ভয় থেকে আরম্ভ করলেও মানুষ ক্রমে ক্রমে যে-সব শক্তি তাদের মঙ্গল সাধন করে, তাদেরও পূজো করতে আরম্ভ করল। যেমন, আর্যদের বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র, প্রাচীন মিশরের সূর্য দেবতা 'রা'-এর পূজোরও প্রচলন হল। মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল, এইসব দেবতারা সন্তুষ্ট হলে শস্য ভালো হবে।

অনুশীলনী

১। প্রস্তরযুগ কাকে বলে? প্রস্তরযুগকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

২। আদিম মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি? সে তার এই অবিষ্কারকে কেমন ভাবে কাজে লাগাল?

৩। আদিম মানুষ কেমন ভাবে চাকা বানাল? এই চাকা আবিষ্কারকে মানুষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলা হয় কেন?

৪। আদিম মানুষ প্রথমে কোথায় বাস করত? কি কারণে তারা গুহা ছেড়ে নতুন ধরনের বাসগৃহ তৈরি করতে লাগল?

৫। মানুষ কেমন ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত? এইভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে কি কি অসুবিধা হয়? এই অসুবিধা দূর করবার জন্য মানুষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করল?

৬। আদিম মানবসমাজে ধর্মের উদ্ভব কেমন ভাবে হয়েছিল? কেন মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজো করত?

তৃতীয় অধ্যায়

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ

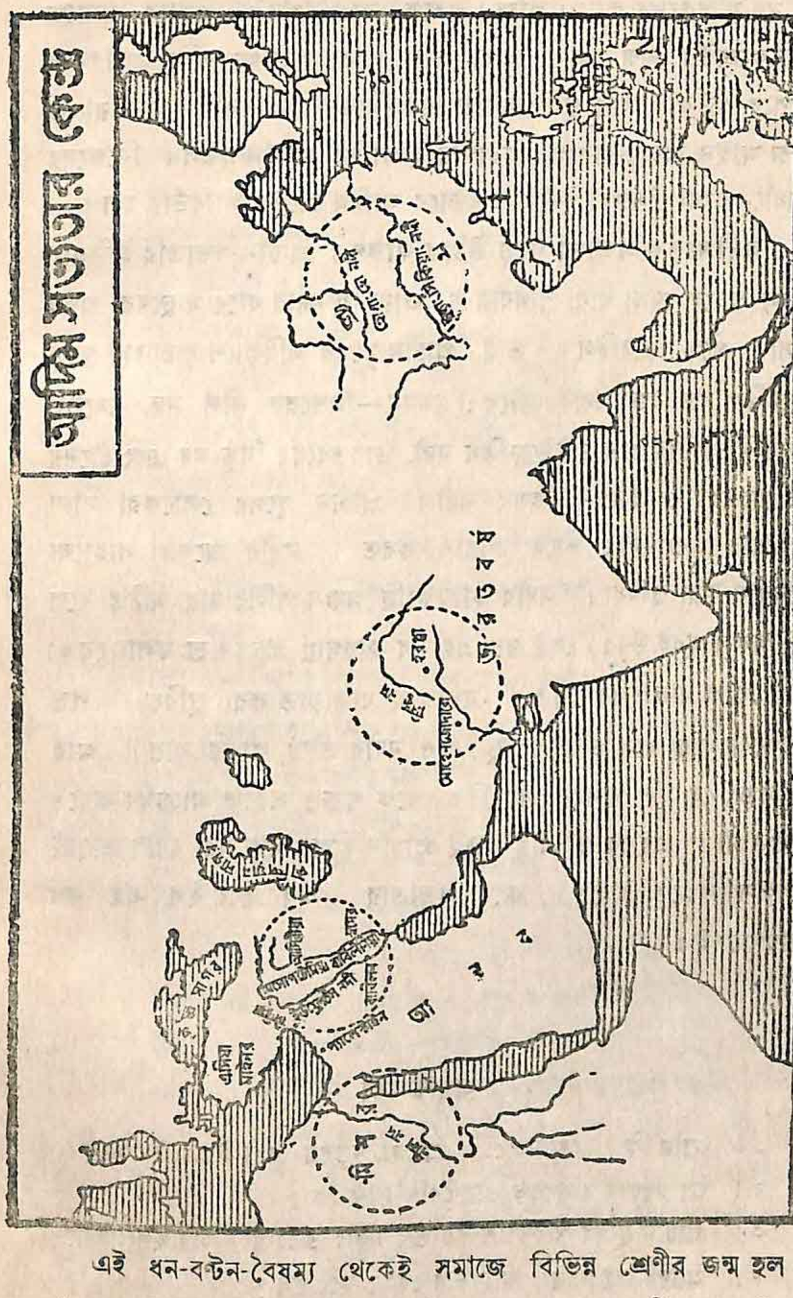
নতুন প্রস্তর যুগের শেষ দিকে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখল। এবার মানুষের সমাজজীবনে এল এক বিরাট পরিবর্তন। প্রথমে মানুষ তামার তৈরি হাতিয়ার বানাতে আরম্ভ করল, কারণ তামা সহজেই পাওয়া যেত এবং গলানোও সহজ ছিল। তামা সম্ভবতঃ প্রথম ব্যবহৃত হয় মিশরে, আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। কিন্তু তামা নরম ধাতু, তাই তামার তৈরি হাতিয়ার বিশেষ কাজের হল না। সেইজন্য প্রয়োজনের তাগিদেই আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখল। ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত বলে ব্রোঞ্জের তৈরি হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি অনেক বেশী উপযোগী হল। ব্রোঞ্জের যুগ শেষ হল আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে লোহা আবিষ্কারের পর। সেই থেকে আজ পর্যন্ত চলেছে লোহার যুগ।

শহরের উদ্ভব ঃ মানুষ যখন চাষ-বাস শিখল, বন্য পশুকে ঘরে পালন করতে শিখল, তখন নতুন ধরনের জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠল। একদল মানুষ যেখানে চাষবাস সম্ভব হল, সেখানে স্থায়ি বাসস্থান তৈরি করে বসবাস করতে লাগল; আর একদল মানুষ পশুচারণ করতে লাগল। যারা পশুচারণ করতে লাগল, তারা ঋতুতে ঋতুতে স্থানে স্থানে ঘুরে ঘুরে পশুচারণ করত। তাদের বলা হত যাযাবর। যারা স্থায়ী বাসস্থান গড়েছিল, তারা বনজঙ্গল সাফ করে ঘরবাড়ি তৈরি করল। মানুষ ঘরবাড়ি তৈরি করত নদীর ধারে বা উপত্যকায়; কারণ এখানে চাষবাসের জন্য জল পাওয়া যেত। এইজন্যই মিশরে নীল নদের ধারে, মেসোপটেমিয়াতে টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেতিস নদী-মধ্যবর্তী অঞ্চলে, ভারতে সিন্ধুনদের ধারে, চীনে হোয়াং-হো নদীর ধারে বাসস্থান গড়ে উঠল। ছোট ছোট গ্রাম লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হল বড় বড় গ্রাম, বড় বড় গ্রাম হল শহর। শহরের চারদিকে দেয়াল

তুলে শহরকে করা হল সুরক্ষিত, কারণ যারা যাযাবরের জীবন যাপন করত, তারা মাঝে মাঝেই এই সব শহর আক্রমণ করত। শহরগুলো আরও ভালো করে গড়ে ওঠে লোহা আবিষ্কৃত হবার পর। কারণ জঙ্গল সাফ করে চাষের জমি তৈরি করার জন্য লোহার তৈরি কুঠার ও কোদালই ছিল বড় সহায়।

উৎপাদন ব্যবস্থার নতুন ধারা ঃ নগরের মানুষদের মধ্যে এবার অনেকেই কৃষিকর্ম ও পশুপালন ছেড়ে অন্যান্য কাজকর্ম করতে লাগল। কেউ কাঠের জিনিসপত্র তৈরি করতে লাগল, কেউ বা মাটির বাসনপত্র, কেউ বা ধাতুর হাতিয়ার বানাতে লাগল। আবার কেউ হয়ত ঘরবাড়ি তৈরির কাজে হাত দিল। এইসব শিল্পীরা তাদের তৈরি জিনিসপত্রের বদলে খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করত। এভাবে সমাজে শ্রম-বিভাগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হল। এরপর থেকে প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে লাগল জিনিসপত্র আরও বেশি করে তৈরি করতে, কারণ তাহলে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে বাড়তিটার বদলে সে অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করতে পারবে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই পরে ক্রীতদাস প্রথার জন্ম দিল। প্রাচীন যুগে যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হোতো, কিন্তু এই সময় থেকে যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে কাজ করিয়ে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা হতে লাগল।

সামাজিক জীবনে পরিবর্তন ঃ এই যুগেই প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্ভব হল। প্রথমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে বোঝাত পশুসম্পদ এবং ক্রীতদাস। পরে জমিও ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় আনা হল। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি-বোধ সমাজে ধনী আর দরিদ্র সৃষ্টি করল। যাদের বেশী পশুসম্পদ, বেশী জমি বা বেশী সংখ্যক ক্রীতদাস ছিল, তারা হল ধনী; আর অন্যান্যরা হল দরিদ্র। এভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষে মানুষে দেখা দিল পার্থক্য। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। তখন সমাজে দু' ধরনের মানুষ ছিল—স্বাধীন মানুষ আর ভৃত্য। ধনী-দরিদ্রের কোন প্রশ্নই তখন ছিল না, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে তখন কিছু ছিল না। কোন জিনিস পাওয়া গেলে সবাই মিলে তা ভোগ করত।



যে-সব নদীর ধারে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল

এই ধন-বন্টন-বৈষম্য থেকেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম হল। যাদের অধিকারে বেশী জমি, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র এবং ক্রীতদাস ছিল, তারা নিজেরা কাজ করত না। আর যাদের এসব ছিল না, তারা

জমির মলিকদের কাছে কাজ করতে বাধ্য হল। এভাবে সমাজে ধনিকশ্রেণীর জন্ম হল। যারা ধনী, তারা সমাজের দরিদ্র লোকদের উপরে কর্তৃত্ব করবার সুবিধার জন্য এবং নিজেদের অধিকার কায়েম রাখার জন্য আইন, বিচার-ব্যবস্থা, কারাগার ইত্যাদির প্রবর্তন করল। নিজেদের অধীনে রাখল সৈন্যবাহিনী। এভাবে আদিম রাষ্ট্রের আবির্ভাব হল।

নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠার কারণঃ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর সব জায়গায় নদীর ধারে মানুষের প্রথম বসতি গড়ে উঠেছিল। তাই প্রাচীন যুগের অধিকাংশ সভ্যতাই গড়ে উঠেছিল বড় বড় নদীর তীরে; যেমন—মিশরের নীল নদ, মেসোপটেমিয়ার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী, ভারতবর্ষের সিন্ধু নদ এবং চীনের হোয়াং-হো ও ইয়াং-সিকিয়াং নদী। প্রাচীন যুগের লোকেরা নানা সুবিধার জন্য নদীর তীরে বসবাস করত। নদীর জলের সাহায্যে চাষবাস করা সুবিধা। নদীর কাছাকাছি অঞ্চল পলির দ্বারা গঠিত বলে ঐ অঞ্চল খুবই উর্বর। সেই জন্য এই সব জায়গায় প্রচুর শস্য ফলান যেত। নদী থেকে মাছও ধরা যেত। নদীপথে যাতায়াত করা সুবিধা। পশু পালনের জন্য ঘাস ও জলের সুবিধাও নদীর তীরে পাওয়া যায়। আর তাছাড়া, যে দিকে নদী সেই দিক থেকে শত্রুও সহজে আক্রমণ করতে পারত না। এইসব সুবিধার জন্যই প্রাচীন যুগের মানুষেরা নদীর তীরেই বসবাস করতে চাইত। ফলে সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল এই সব জায়গাতেই।

অনুশীলনী

১। ব্রোঞ্জ কি? তামার চেয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র বেশী উপযোগী কেন?
২। ব্রোঞ্জযুগের মানবসভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি কি?
৩। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ সভ্যতাই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল কেন?
৪। আদিম রাষ্ট্রব্যবস্থার আবির্ভাব কেমন করে হল?
৫। তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগে কিভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থায় পরিবর্তন দেখা দিল?
৬। নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ কি?

৭। **দু-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) প্রাচীন মানব সমাজে কার প্রাধান্য ছিল ?

(খ) মানুষ কেন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করতে লাগল ?

(গ) প্রাচীন যুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে কি বোঝাত ?

(ঘ) ব্রোঞ্জ যুগে যুদ্ধবন্দীদের মেরে ফেলা হোতো না কেন ?

(ঙ) কোন্ নদীর ধারে মিশরীয়-সভ্যতা গড়ে ওঠে ?

(চ) অধিকার কায়েম রাখার জন্য ধনীরা কি করেছিল ?

(ছ) যাযাবর কাদের বলা হোতো ?

(জ) ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতায় কি কি জিনিস এল ?

(ঝ) লোহা কত বছর আগে আবিষ্কৃত হয় ?

৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) তামার সঙ্গে — মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়।

(খ) টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীকে কেন্দ্র করে — সভ্যতা গড়ে ওঠে।

(গ) — থেকেই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্ম হয়।

(ঘ) শহরের চারিদিকে — তুলে শহরকে করা হল সুরক্ষিত।

(ঙ) আগে — সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না।

(চ) তামা প্রথম ব্যবহৃত হয় —।

(ছ) ব্রোঞ্জের যুগ শেষ হলে — যুগ শুরু হয়।

(জ) — বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাই — প্রথার জন্ম দিল।

(ঝ) শহরগুলো ভাল করে গড়ে ওঠে — আবিষ্কারের পর।

(ঞ) নদীর জলের সাহায্যে — করা সুবিধা।

(ট) প্রচীন সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল — অঞ্চলে।

(ঠ) —গঠিত বলে নদীর কাছাকাছি অঞ্চল খুব উর্বর।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ

মেসোপটেমিয়া

অবস্থান ও সভ্যতার উন্মেষ ঃ পারস্য উপসাগরের উত্তরে বর্তমানে যে দেশটির নাম ইরাক, তাকেই প্রাচীনকালে বলা হোতো মেসোপটেমিয়া। গ্রীকরা এই দেশটির এরূপ নাম দিয়েছিল। 'মেসো-



মানচিত্রে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া

পটেমিয়া' শব্দটির অর্থ ঃ **'দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল'**।' এই দেশের পূর্ব দিক দিয়ে টাইগ্রিস নদী এবং পশ্চিম দিকে ইউফ্রেতিস নদী লম্বালম্বি ভাবে বয়ে গেছে।

পুরাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে মাটির নিচে নগর-সভ্যতার যে-সব চিহ্ন পেয়েছেন, তাতে এই সভ্যতাকে মিশরের সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন বলে অনেকে মনে করেন।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে সুমেরীয় নামে এক জাতি দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা যে কোন্ জাতের মানুষ, আজও তা স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কেউ কেউ বলেন, আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সিন্ধু-উপত্যকায় যে মানুষেরা বাস করত তারাও ছিল এই সুমেরীয়দেরই মত।

এখানে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশের কারণ ঃ অতি প্রাচীনকালে সুমের অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ ছিল। এখানে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পাওয়া যেত, আর পানীয় জলের অভাব ছিল না। গৃহপালিত পশুর খাদ্যও পাওয়া যেত প্রচুর। তাছাড়া স্থায়িভাবে ঘর তৈরি করে বসবাস করার মত উপাদানেরও অভাব এখানে ছিল না। এই সুবিধেগুলো পাওয়া গিয়েছিল বলেই সুপ্রাচীনকালে মানুষ এখানে বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। মিশরের নীল নদের উপত্যকা, ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকা প্রভৃতি স্থানেও এই ধরনের সুযোগ-সুবিধে ছিল বলে এসব জায়গাতেও খুব প্রাচীনকালে মানবসভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

মৃত্তিকার উর্বরত্ব ও শস্য উৎপাদন ঃ নদীর পলিমাটি যে অঞ্চলে পড়ে, সে-সব জায়গা খুব উর্বর হয়। মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে টাইগ্রিস আর ইউফ্রেতিস নদী দু'কূল ভাসিয়ে চারদিকে পলিমাটি ফেলত। তার ফলে মাটি খুব উর্বর হোতো এবং এই উর্বর মাটিতে প্রচুর শস্য জন্মাত। তবে, বর্ষার পরে জল নেমে গেলে মাঠ শুকিয়ে যেত। তখন চাষবাসের জন্য জলের দরকার পড়ত। চাষের মাঠে জল আনার জন্য সুমেরীয়রা বহু খাল খনন করেছিল। প্রাচীন গ্রীসের ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের রচনা থেকেও সুমেরীয়দের খাল খননের কথা জানা যায়। তাঁর লেখা থেকেই জানা যায় যে, সেখানে যব, গম, বাজরা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো। শস্যের উপরই নির্ভর করে দেশের সমৃদ্ধি, শাসকদের আয়। শস্য বেশি হলে রাজস্ব বেশি উঠত। তাই শাসকরা জলসেচের দিকে খুব নজর রাখতেন এবং জলসেচের অভাব যাতে না হয়, সেজন্য সব সময় সচেষ্ট থাকতেন।

বন্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ঃ গল্প আছে যে, সুমেরীয়দের এক দেবতা মারডুক জলাসুর টিয়ামতের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি নতুন ভূমি তৈরি করেছিলেন। এরকম গল্পও শোনা যায় যে, মারডুক জল থেকে স্থলকে আলাদা করেছিলেন এবং জলের মধ্যে তৈরি-করা ভূমিতে মানুষের বাসস্থান গড়েছিলেন। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, সুমেরীয়রা ভূমি পুনরুদ্ধার করতে জানত এবং বন্যার কবল থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ তৈরি করত। জলাধার তৈরি করতেও তারা পারদর্শী ছিল।

সুমেরীয়দের জীবিকা ঃ সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। কৃষকদের জমি ভাগ করে দেওয়া হোতো। কৃষকরা রাজস্ব হিসেবে দিত শস্য। সাধারণতঃ উৎপাদনের এক-দশমাংশ ছিল রাজস্ব। এই রাজস্ব যেত রাজকীয় শস্যভাণ্ডারে। রাজকীয় খামার এবং দেবোত্তর সম্পত্তিগুলো চাষ করানো হোতো দাস-শ্রমিকদের দিয়ে।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কুড়িটিরও বেশি ছোট ছোট রাজ্য ছিল। রাজ্যগুলির নাম জানা যায় না। শুধু এটুকু জানা যায় যে, 'পতেসি' নামক পুরোহিত শাসকরা এসব রাজ্য শাসন করতেন। শেষদিকে বড় বড় পতেসিদের মধ্যে একাধিপত্য স্থাপনের সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

সুমেরীয়দের কৃতিত্ব

স্তম্ভ ও মন্দির তৈরি ঃ সুমেরীয়রা কাদামাটির সঙ্গে ছাটা নলখাগড়া এবং ঘাস মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে খুব শক্ত ইট তৈরি করতে পারত। এই ইট দিয়ে তারা একতলা ঘর তৈরি করত। ঘর খুব মজবুত হোতো। সুমের অঞ্চলে পাথর পাওয়া কষ্টকর ছিল বলে ওখানকার বাড়িঘর এবং স্তম্ভ এই ইট দিয়েই তৈরি হোতো। নিপ্পর নামক এক জায়গাতে সুমেরীয়রা খুব বড় একটা ইটের স্তম্ভ তৈরি করেছিল। স্তম্ভটি নির্মিত হয়েছিল সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা এন-লিল বা এন-লিলের সম্মানে। সুমেরীয়দের দেশ ছিল মঠমন্দিরে ভরা। পুরোহিত শ্রেণীই ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তাঁরাই ছিলেন শাসক। এন-লিল, উতু (সূর্যদেবতা), মারডুক প্রভৃতি ছিলেন সুমেরীয়দের দেবতা।


দেবী ইসতার

ভাস্কর্য ও দেওয়ালচিত্র ঃ ভাস্কর্য ও দেওয়াল চিত্রাঙ্কনেও সুমেরীয়রা কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। ইটের তৈরি দেয়ালে কিরূপ সুন্দর সুন্দর ছবি

তারা আঁকত, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ব্যাবিলনের ইসতার গেটে রোদে-ঝলসানো ইটের তৈরি স্থাপত্যের গায়ে ষাঁড় ও ভেড়ার ছবি দেখলে। মিশরের দেওয়ালচিত্রগুলো ওখানকার শুকনো আবহাওয়ার জন্য অনেক ক্ষেত্রে অক্ষত আছে, কিন্তু সেই তুলনায় মেসোপটেমিয়ার দেওয়ালচিত্র তেমন পাওয়া যায় না।

পাথরের কাজঃ সুমেরীয়রা পাথর কেটেও মূর্তি তৈরি করতে পারত। তবে, পাথর বেশি পাওয়া যেত না বলে পাথরের কাজ ওখানে কম ছিল। পাথরে খোদাই-করা সুমেরীয় যোদ্ধাদের একটি নমুনা পাওয়া গেছে। সুমেরীয়রা পাথরের কাজে যে কত দক্ষ ছিল, তা এর থেকে বোঝা যায়। পরবর্তীকালে আসিরীয়দের ভাস্কর্যে পাথর ব্যবহৃত হোতো। মিশরের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ার পর টাইগ্রিস ইউফ্রেতিস অঞ্চলে পাথর আমদানি করা হতে থাকে।

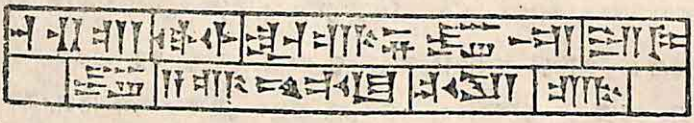
ধাতুদ্রব্য ব্যবহারঃ ধাতুদ্রব্য ব্যবহারের দিকেও সুমেরীয়রা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। ব্যাবিলন অধিকারের সময়েই তামার ব্যবহার তারা শিখেছিল। আল্-উবেইদ-এর কাছে একটি মন্দিরে তামার সিংহ ও ষাঁড় পাওয়া গেছে। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে সুমেরীয়রা ব্রোঞ্জ তৈরি করতে পারত। তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি ছিল তামার। সুমের দেশের লোকেরা সোনা, রূপো, তামা, হাতীর দাঁত ইত্যাদির ব্যবহারও জানত।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও পরিবহণঃ সুমেরীয়রা শুধু কৃষিকর্মই জানত না, তারা ব্যবসা বাণিজ্যও করত। উত্তর পশ্চিম ভারতে তাদের বাণিজ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে পরিবহণের কাজে তারা নৌকো, জাহাজ প্রভৃতি ব্যবহার করত। ভারতের সঙ্গে সম্ভবতঃ সমুদ্রপথে জাহাজযোগে তাদের ব্যবসা চলত। ডাঙায় ভারি জিনিসপত্র বহন করার জন্য তারা গাধায় টানা চাকাওয়ালা গাড়ির ব্যবহার শিখেছিল। গাড়ির চাকা সম্ভবতঃ সুমেরীয়রাই প্রথমে বানিয়েছিল।

লিপিঃ সুমেরের লোকেরা মাটি দিয়ে টালি তৈরি করে নল-খাগড়ার কলম দিয়ে কাঁচা টালির উপর নানা বিষয় লিখে রাখত। পরে

এই টালিগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে বা রোদে শুকিয়ে নিত। মাটির এই পুঁথিগুলি কোণাকার হরফে লেখা হোতো বলে এই লেখার কৌশলকে বলা হত **কৌণিক লিখন** পদ্ধতি।

সুমেরীয়রা মিশরীয়দের মত শব্দ-চিত্র থেকে অক্ষর সৃষ্টি করতে পারে নি। কৌণিক লিপিতে 'ক' বা 'ব' লেখা যায় না, কিন্তু 'কর' বা 'বন' লেখা যায়। সুমেরীয়রা এ ধরনের ৩৫০টি চিহ্ন ব্যবহার করত। এভাবে তারা চিঠিপত্র লিখত, হিসেব রাখত, এমন কি বইও লিখত।



কৌণিক লিপি

সুমেরীয়রা এক থেকে ষাট পর্যন্ত গুণতে পারত। ব্যাবিলনে পাথরের উপর লেখা একটি চিকিৎসাশাস্ত্র পাওয়া গেছে। ওখানে সকালে ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো করার জন্য পাঠশালাও ছিল। পড়ুয়ারা ভিজে মাটির শ্লেটে লেখা অভ্যাস করত এবং দরকারমত কাঠের টুকরো দিয়ে সেই লেখা মুছে ফেলত। এরকম একটা পাঠশালা মাটি খুঁড়ে বের করা হয়েছে। এসব দেখে বোঝা যায়, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা কত উন্নত ছিল।

অনুশীলনী

১। 'মেসোপটেমিয়া' শব্দের অর্থ কি? এখানে প্রাচীনকালে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল কেন?
২। হেরোডোটাস কে? তিনি সুমেরীয়দের সম্বন্ধে কি বলেছেন?
৩। বন্যা সম্বন্ধে সুমেরীয়দের মধ্যে কি গল্প প্রচলিত ছিল?
৪। ভাস্কর্য ও দেওয়াল চিত্রাঙ্কনে সুমেরীয়দের দক্ষতার পরিচয় দাও।
৫। সুমেরীয়রা কি কি ধাতুর ব্যবহার জানত?
৬। কৌণিক লিপি কি? এর বিশেষত্ব কি?
৭। প্রাচীন ব্যাবিলনে ছেলেমেয়েরা কিভাবে পড়াশুনো করত?
৮। সুমেরীয়দের জীবিকা কি রকম ছিল?
৯। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য হোতো?
১০। **দু-এক কথায় উত্তর দাও :**
(ক) মেসোপটেমিয়া বর্তমানের কোন্ দেশ?
(খ) মেসোপটেমিয়ায় কোন্ দুটি নদী ছিল?
(গ) মেসোপটেমিয়ায় কি কি শস্য ফলত?

(ঘ) সুমেরীয় কৃষকরা কতটা রাজস্ব দিত ?

(ঙ) 'পতেসি' কারা ?

(চ) সুমেরীয়দের প্রধান দেবতা কে ছিলেন ?

(ছ) ব্রোঞ্জ কি দিয়ে তৈরি হয় ?

(জ) সুমেরীয়রা কিসের উপর লিখত ?

১১। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(ক) গাড়ির চাকা সম্ভবতঃ — প্রথম বানিয়েছিল।

(খ) সুমেরদের দেশ ছিল — ভরা।

(গ) সুমেরদের অস্ত্রশস্ত্রগুলি ছিল —।

(ঘ) — আবহাওয়ার জন্য মিশরের দেওয়ালচিত্রগুলো অক্ষত রয়েছে।

(ঙ) সুমেরীয়দের প্রধান জীবিকা ছিল —।

(চ) লেখার জন্য সুমেরীয়রা — টি চিহ্ন ব্যবহার করত।

(ছ) সুমের অঞ্চলে — দিয়ে বাড়িঘর তৈরি হোতো।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মিশরের প্রাচীন সভ্যতা

অবস্থান ও জমির প্রকৃতি ঃ আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে মিশর দেশ। এখানে বৃষ্টি হয় খুব কম, সেই জন্য দেশটি শুষ্ক ও উষ্ণ। মিশরের পশ্চিম দিকে আছে বিরাট সাহারা মরুভূমি।



মানচিত্রে প্রাচীন মিশর

নীলনদ এ-দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত না হলে দেশটি মানুষের

বসবাসের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হোতো। এই নদ মিশরের বুক চিরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। প্রতি বছর নীলনদে বন্যা হয়। ঐ সময় নীলনদের দুই তীরের জমিগুলি জলে ডুবে যায়। জল যখন সরে যায়, তখন ঐ জমিগুলি পলিমাটিতে ঢাকা পড়ে। এভাবে নীলনদের বন্যা প্রতি বছর মিশরকে উর্বর করে। নীলনদ না থাকলে মিশর দেশটি মরুভূমিতে পরিণত হোতো। এইজন্য মিশরকে বলা হয় 'নীলনদের দান'। নীলনদের এই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলটি দৈর্ঘ্যে ৭৫০ মাইল এবং প্রস্থে দশ থেকে পনের মাইল।

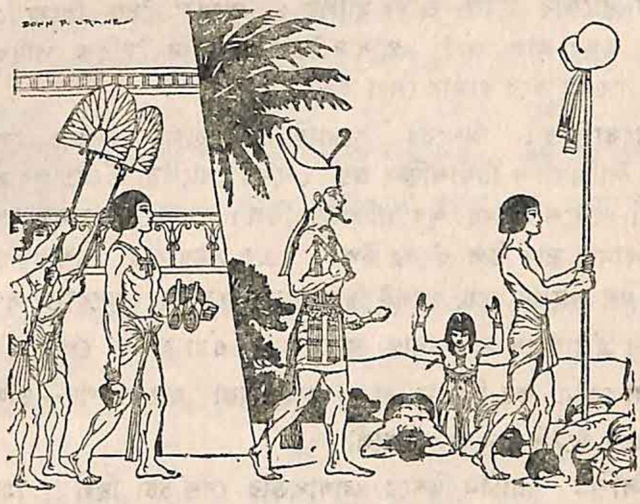
সভ্যতার উন্মেষঃ খুব প্রাচীনকাল থেকেই ভবঘুরে যাযাবরেরা দলে দলে এসে নীলনদের তীরে বসবাস আরম্ভ করে। এরা ছোট ছোট নগরে বা পল্লীতে বিভিন্ন শাসকদের অধীনে সরলভাবে জীবন যাপন করত। নীলনদকে তারা দেবতা বলে মনে করত। ক্রমে ক্রমে এই সব ছোট ছোট রাজ্যগুলো যুক্ত হয়ে একটি বড় রাজ্য গড়ে ওঠে।

কিন্তু এই মিশে-যাওয়া যে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে করা হয়েছিল, তা নয়। এজন্য এক জনপদের সঙ্গে আর এক জনপদের লড়াই হয়েছে। এভাবে সারা মিশরে এক সময় দুটি বড় রাজ্য গড়ে ওঠে— একটি উত্তর মিশরে, আর একটি দক্ষিণ মিশরে। শেষ পর্যন্ত এ দুটি রাজ্যের মধ্যেও সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে দক্ষিণের রাজ্যটি সবচেয়ে বড় হয়ে ওঠে। উত্তরের রাজ্যটি দক্ষিণের রাজ্যের কাছে হেরে যায়। অতঃপর সারা মিশরে একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। এ ঘটনা ঘটে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

ফ্যারাওঃ মিশরের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মিশরে নাকি পরপর ত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করে। যিনি প্রথম সমগ্র মিশরকে নিয়ে একটা বড় রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁর নাম মেনেস। মেনেসের সময় থেকেই মিশরের রাজাকে বলা হয় 'ফ্যারাও'। 'ফ্যারাও' শব্দের অর্থঃ 'যিনি বড় বাড়িতে থাকেন'।

ভিন্ন ভিন্ন বংশের ফ্যারাওরা প্রায় তিন হাজার বছর মিশরে

রাজত্ব করেন। ফ্যারাওদের রাজত্বকালের প্রথম দিকে হিকসস্ নামে একদল এশিয়াবাসী মিশর আক্রমণ করে ঐ দেশ জয় করে নেয়।



রাজা মেনেস

'হিকসস্' শব্দটির অর্থ মেষপালক। মনে হয় হিকসস্‌রা পশুপালক যাযাবর জীবন যাপন করত। হিকসস্‌রাই মিশরে প্রথম ঘোড়ার প্রচলন করে। হিকসস্ রাজারা ছিলেন খুব অত্যাচারী। এঁরা প্রায় দুশো বছর ধরে মিশরে রাজত্ব করেন। অবশেষে মিশর আবার স্বাধীন হয়। হিকসস্‌দের তাড়িয়ে দিয়ে মিশরের একজন শক্তিশালী রাজা বর্তমান এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, আরমেনিয়া ইত্যাদি অঞ্চল জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর নাম তৃতীয় থুত্‌মোস্। তৃতীয় থুত্‌মোসের অধীনে বহু তীরন্দাজ সৈন্য, রথী ও নৌবাহিনী ছিল। তাঁর আমলে মিশর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ ছিল। এই সময় মিশর কৃষিকর্মে, শিল্পে এবং স্থাপত্যে খুব উন্নতি করেছিল।

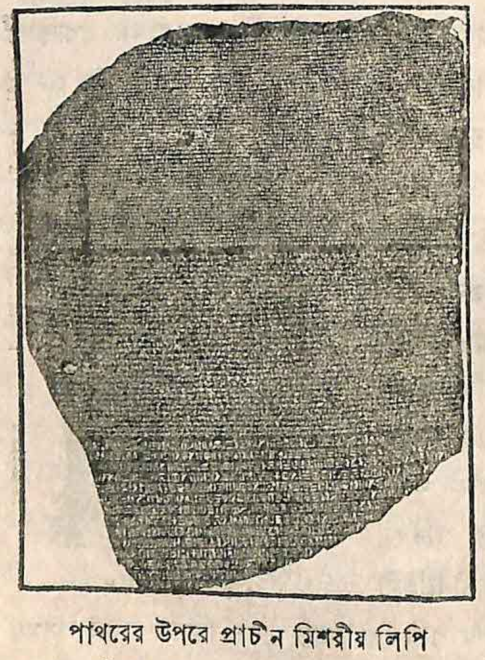


তৃতীয় থুত্‌মোস

মিশরের লোক ফ্যারাওদের দেবতার মত মান্য করত। ফ্যারাও ছিলেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। ধর্ম ও রাষ্ট্রের তিনিই ছিলেন নেতা। তিনিই ছিলেন রাজ্যের সমস্ত জমির মালিক। প্রজারা সৈন্য হিসেবে যুদ্ধ ক'রে, অথবা খাল কাটা, প্রাসাদ তৈরি ইত্যাদি দৈহিক পরিশ্রমের কাজে সাহায্য করে রাজার সেবা করত।

পুরোহিত: মিশরের পুরোহিতরা ছিলেন পণ্ডিত লোক। এঁদের পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশক্তির জন্য দেশের লোকেরা এঁদের খুব সম্মান করত। দেশে এঁদের খুব প্রতিপত্তি ছিল। মন্দিরের সমস্ত সম্পত্তি দেখাশোনার ভার ছিল এঁদের উপর। এক সময় সারা মিশরের চাষের জমির দশ ভাগের সাত ভাগই ছিল পুরোহিতদের। দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে এঁরাই সে জমি ভোগ করতেন। এঁরা রাজস্ব পেতেন, কিন্তু নিজেরা কোন কর দিতেন না। তাই বিদ্যা এবং সম্পদ—দুদিকেই এঁরা হয়ে উঠেছিলেন প্রতাপশালী।

লিপি: প্রাচীন মিশরে লেখাপড়ার বেশ চর্চা ছিল। মিশরের পুরোহিতরাই ছিলেন শিক্ষক। মন্দিরের কাছেই থাকত পাঠশালা। মানুষের মুখের কথাকে সর্বপ্রথম লিখে রাখবার ব্যবস্থা করে মিশরীয়রা। তারা ছোট ছোট ছবি এঁকে সেই ছবির সাহায্যে তাদের মনের কথা প্রকাশ করত। মিশরের পুরোহিতরা এই ছবিগুলোর অর্থ বুঝতে পারতেন। এই রকম অনেক ছবি প্রাচীন মিশরের মন্দিরে রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে এবং প্যাপাইরাসের উপর পাওয়া গেছে। নীল-



পাথরের উপরে প্রাচীন মিশরীয় লিপি

নদের তীরে যে নলখাগড়া জন্মাত, তারই শাঁস দিয়ে তৈরি হত

প্যাপাইরাস। প্যাপাইরাসকেই পেপার বা কাগজের আদিপুরুষ বলা যায়। মিশরের পুরোহিত সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যাবার পর এই চিত্রলিপি বা ছবির অক্ষর সাজিয়ে রচিত বাক্যের মানে বোঝা খুব মুশকিল হত। বহুদিন পর্যন্ত এই চিত্রলিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৮২০ সালে শাঁপোলিয়েঁা নামে একজন ফরাসী অধ্যাপক অনেক চেষ্টার পর এই চিত্রলিপি পড়তে পারলেন। এই সব চিত্রলিপি পাঠ করে আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বহু তথ্য জানতে পেরেছি।

কর-সংগ্রাহক ঃ মিশরে সমস্ত জমির মালিক ছিলেন ফ্যারাও। তাঁর অধীনে অভিজাত ব্যক্তিরা এইরূপ জমির মালিক হতেন। অভিজাতরা এই জমি চাষ করতে দিতেন কৃষকদের। তবে, মিশরের কৃষকরা ক্রীতদাস ছিল না। জমির মালিক না-হওয়াতে কোন-না-কোন অভিজাত ব্যক্তির অধীনে তাদের কাজ করে পেট চালাতে হোতো। জমি চাষ করার বিনিময়ে তাকে রাজস্ব দিতে হোতো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজস্ব দেওয়া হোতো জমির ফসল দিয়ে। রাজস্ব সংগ্রাহক কৃষকদের সঙ্গে সব সময় ভালো ব্যবহার করত না। রাজস্ব দিতে না পারলে তাদের জোর করে ধরে নিয়ে আসা হোতো। এরকম জোর করে ধরে এনে রাজস্ব আদায়ের ছবি পাওয়া গেছে।

সেনাবাহিনী ঃ প্রাচীনকালে সাধারণ মানুষের মধ্যে আজকের মত জাতীয়তাবোধ ছিল না। সুতরাং সেকালের রাজাদের আজকের মত জাতীয়-বাহিনীও ছিল না। রাজারা যুদ্ধবন্দীদের এবং ভৃত্যদের সামরিক অভিযানে ব্যবহার করতেন। এদের কারো কোন ঘরবাড়ি ছিল না। সুতরাং ঘরে ফিরে যাওয়ার তাগিদও ছিল না। ফ্যারাওরা নুবিয়া নামক একটা জায়গায় হানা দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ লোকদের ধরে নিয়ে আসতেন সেনাবাহিনী তৈরি করার জন্য। বর্বর লোকদের ভাড়া করেও সেনাবাহিনীতে রাখা হোতো। এজন্য তাদের খাওয়া-পরা দেওয়া হোতো, রাজ্যের বাইরে লুঠতরাজ করার সুযোগও দেওয়া হোতো। প্রয়োজনের তাগিদে এই বর্বর লোকেরা ফ্যারাওদের সেনাবাহিনীতে কাজ নিত। যুদ্ধবন্দীদেরও কখনও কখনও

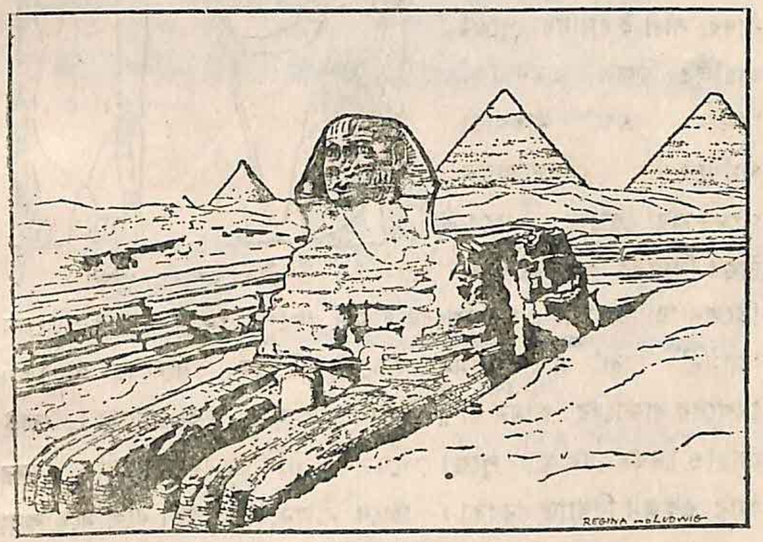
সেনাবাহিনীতে নেওয়া হোতো। বন্ধুভাবাপন্ন দেশের লোকদের মধ্য থেকেও কখনও কখনও সৈন্য নিয়োগ করা হোতো।

শ্রমিক : যুদ্ধবন্দী, ক্রীতদাস, স্বেচ্ছাদাস প্রভৃতি লোকেরাই মিশরে শ্রমের কাজ করত। যুদ্ধবন্দী দাসদের বড় বড় কাজে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করা হোতো। বাঁধ তৈরিতে, খাল খননে এরাই শ্রমিকের কাজ করত। সেই সময় পাথর ভাঙ্গা, খনি থেকে ধাতব আকর তোলা খুবই কষ্টকর কাজ ছিল। সেইজন্য দাসদের দিয়ে এসব কাজ করানো হোতো। শিল্প ও কারিগরি কাজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসদের ব্যবহার করা হোতো। বাণিজ্যদ্রব্য, বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, ধাতুদ্রব্য—সবই প্রায় তাদের দিয়ে তৈরি করানো হোতো। যারা এসব কাজে পারদর্শী ছিল, তাদের স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়া হোতো। স্বাধীন দাসেরা মজুরি নিয়ে কাজ করত।

বাণিজ্য : পৃথিবীতে বাণিজ্যের প্রচল হয়েছিল খুবই প্রাচীন কাল থেকে। কিন্তু মিশর ও মেসোপটেমিয়া অঞ্চলের লোকেরাই বাণিজ্যে প্রথম পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। প্রাচীনকালে আজকের মত মুদ্রা আবিষ্কার হয় নি বলে দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতে ব্যবসা-বাণিজ্য হোতো। জিনিসপত্র বদল করে বাণিজ্য করার নমুনা প্রাচীন মিশরের দেওয়াল চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। নানা দেশের সঙ্গে স্থলপথ ও জলপথে মিশরের বাণিজ্য চলত। ফ্যারাওরা সুদান থেকে হাতির দাঁত, উটপাখির পালক ইত্যাদি আনার জন্য গাধা পাঠাতেন। বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে জাহাজ যেত ফিনিসিয়াতে। লোহিতসাগর হয়ে মিশরের বাণিজ্যতরী পূর্ব আফ্রিকার উপকূল ও আরব দেশে যেত।

পিরামিড ও স্ফিংস : ফ্যারাও বা মিশরের রাজাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল পিরামিড। ফ্যারাওরা নিজেদের সমাধির জন্য এই পিরামিডগুলি তৈরি করেন। বড় বড় পাথরের টুকরো কেটে পর পর সাজিয়ে পিরামিড তৈরি করা হোতো। মিশরের গিজে নামক স্থানে এই রকম নয়টি পিরামিড আছে। এগুলির মধ্যে খুফু নামে এক ফ্যারাও-এর তৈরি পিরামিডটিই সবচেয়ে বড়। এটির উচ্চতা ১৬০

মিটার, অর্থাৎ কলকাতার শহীদ মিনারের (৫২ মিটার) তিনগুণেরও বেশী উঁচু এবং নিচের দিকটা ২৫৮ মিটার চওড়া। এই পিরামিড তৈরি করতে এক লক্ষ বিশ হাজার লোকের ২০ বছর সময় লেগেছিল। এতে পাথর লাগানো হয়েছিল ২৩ লক্ষ। প্রতিটি পাথরের টুকরোর ওজন ছিল হু'টন।

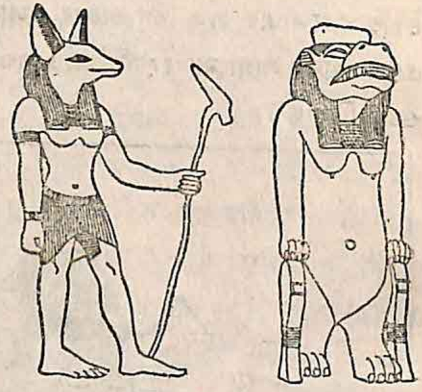


মিশরের পিরামিড ও স্ফিংস

পিরামিডের যুগের আর একটি আশ্চর্য জিনিস স্ফিংস। এটি একটি পুরো পাহাড় কেটে তৈরি। এটি দৈর্ঘ্যে ৫৩ মিটার এবং উচ্চতায় ২৪ মিটার। এর শরীরটা সিংহের, কিন্তু মাথাটা মানুষের।

মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত যে, মানুষের মৃতদেহ যতদিন নষ্ট না হয়ে যায়, ততদিন তার আত্মা সুখে থাকে। তাই তারা মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাপড়ে জড়িয়ে আরক মাখিয়ে রাখত। এভাবে রাখার ফলে মৃতদেহ পচে যেত না। মৃতদেহকে এভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থাকে বলা হয় 'মমি' করা। মৃত্যুর পরে পরলোকে ব্যবহারের জন্য ফ্যারাওদের মমির পাশে খাবার জিনিস, পোশাক-পরিচ্ছদ, সোনা-রূপো, আসবাবপত্র ইত্যাদি সযত্নে গুছিয়ে রাখা হোতো। সম্প্রতি ফ্যারাও তুতেনখামেনের সমাধি থেকে নানা প্রকার মূল্যবান আসবাবপত্র পাওয়া গেছে।

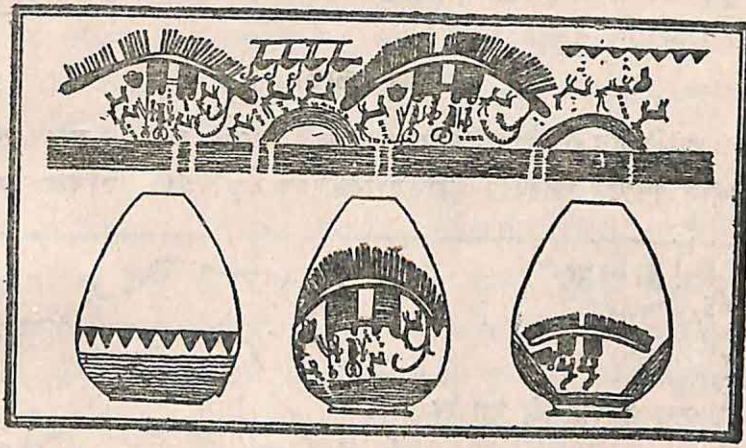
ধর্মবিশ্বাস ঃ মিশরের লোকেরা অনেক দেব-দেবীর পুজো করত। দেবতাদের মধ্যে ওসিরিস, হোরাস এবং দেবী আইসিস ছিলেন প্রধান। এ ছাড়াও মিশরীয়রা গাছপালা এবং জীবজন্তুরও পুজো করত। গরু, ভেড়া, বাঁদর, সাপ ইত্যাদির পুজো প্রচলিত ছিল। এমন কি, বিড়াল এবং মাছরাঙা পাখিকেও দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হোতো। তবে, উত্তর মিশরের প্রধান দেবতা ছিলেন 'রা' বা 'রী' এবং মিশরের দক্ষিণ অংশের প্রধান দেবতা ছিলেন 'আমন'। 'রা' এবং 'আমন' উভয়েই ছিলেন সূর্যদেবের প্রতীক। মিশরের রাজাদের 'আমন-রী'র সন্তান বলে মনে করা হোতো। তাই তাঁরাও দেবতাদের মত পুজো পেতেন। ওসিরিস ছিলেন মিশরীয়দের আর একজন বিখ্যাত দেবতা। তাঁকে নীলনদের দেবতা বলে মনে করা হোতো। ইনি ছিলেন মৃত্যু এবং নবজীবনের দেবতা। দেবতা ওসিরিস আমাদের যমরাজের মত; তিনি মানুষের মৃত্যুর পর বিচার করতেন।



প্রাচীন মিশরের দেবতা

জীবিকা ঃ প্রাচীন মিশরের জীবনযাপন প্রণালী ছিল আমাদের মতই। আমাদের মতই কৃষি ছিল ওদের প্রধান জীবিকা। বাসন তৈরি, ধাতুদ্রব্য তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিও ছিল ওদের জীবিকা। মিশরের পুরনো স্থাপত্য থেকেও ওখানকার দৈনন্দিন জীবনযাপন প্রণালীর একটা হদিস পাওয়া যায়। আমাদের মতই মিশরের লোকেরা চাষবাস করত, ক্ষেত নিড়াত, শস্য কাটত, মাড়াই করত, গরু দোয়াত, মাছ ধরত, কামার এবং কুমোরের কাজ করত। দাঁড়িপাল্লা দিয়ে জিনিস মেপে কেউ বা জিনিসপত্র বেচত, কেউ বা গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে স্থলপথে পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। বাণিজ্যতরীতে চেপে দূর দূর দেশেও পণ্যসম্ভার নিয়ে

যেত তারা। সব মিলিয়ে ঠিক আমাদের মতই জীবনযাপন করত সেই সময়ের মিশরের লোকেরা। শুধু আজকের মত এত সব যানবাহন



প্রাচীন মিশরের চিত্রিত মাটির পাত্র

এবং কলকারখানা সেকালে ছিল না। তবে হাতে জিনিসপত্র তৈরি করার মত কর্মকেন্দ্র ছিল প্রচুর।

অনুশীলনী

১। মিশরে কিভাবে সভ্যতার উন্মেষ ঘটে ?

২। 'ফ্যারাও' শব্দটির অর্থ কি ? ফ্যারাওরা মিশরে কি কি সুবিধা ভোগ করতেন ?

৩। মিশরীয় পুরোহিতদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। কিভাবে মিশরে সেনাবাহিনী তৈরি করা হোতো ?

৫। পিরামিড কি ? পিরামিড সম্বন্ধে যা জান বল।

৬। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ?

৭। প্রাচীন মিশরীয়দের জীবিকা কেমন ছিল ?

৮। **দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) 'হিকসস্' শব্দটির অর্থ কি ?
(খ) সমগ্র মিশরকে নিয়ে কে প্রথম একটা বড় রাজ্য স্থাপন করেন ?
(গ) পিরামিডগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় কোনটি ?
(ঘ) 'মমি' করা কাকে বলে ?
(ঙ) কিসের উপরে মিশরীয়রা লিখত ?
(চ) কে আমাদের প্রাচীন মিশরীয় লিপি পড়তে শেখান ?

সিন্ধু সভ্যতা

আবিষ্কারঃ বেশ কয়েক বছর আগের কথা। স্যার জন মার্শাল ছিলেন ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বড় কর্তা। রাখালদাস



সিন্ধু উপত্যকা

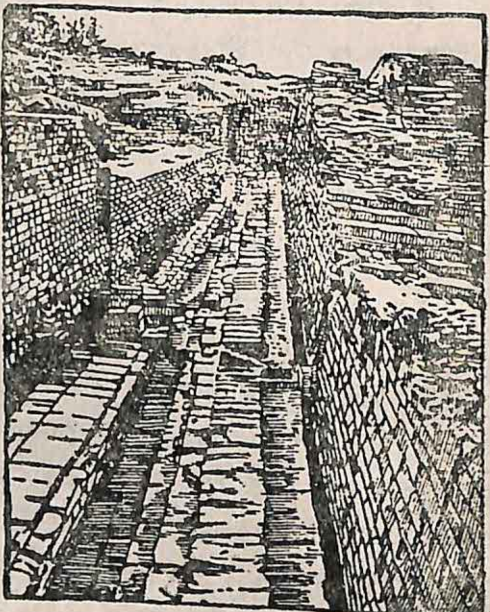
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহকারী। ইনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদ। পুরাতত্ত্ববিদদের কাজ হল প্রাচীন

ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। সিন্ধুপ্রদেশের (বর্তমানে পাকিস্থানে) লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদাড়ো নামে একটা অনুর্বর জায়গা আছে। 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দটির অর্থ হল 'মৃতের স্তূপ'। ১৯২১ সালে স্যার জন মার্শাল ওখানে একটি দল পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহেঞ্জোদাড়োর উত্তর-পশ্চিমে যে বৌদ্ধ স্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ আছে, তার মধ্যে থেকে যদি কিছু আবিষ্কার করা যায়। ঐ দলে ছিলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালদাস একদিন হঠাৎ মাটির তলা থেকে শিলমোহর আবিষ্কার করলেন। এইরকম কয়েকটি শিলমোহর পাওয়া গিয়েছিল তার আগের বছর পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার হরপ্পা থেকে। রাখালদাসের মনে হল—তিনি যে শিলমোহর পেয়েছেন, সেগুলোর সঙ্গে হরপ্পার শিলমোহরগুলোর নিশ্চয় যোগ আছে। তখন এই বৌদ্ধ মঠটির আশেপাশে খননকার্য আরম্ভ হল। এর ফলে বের হল প্রাচীন যুগের ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। হিসাব করে দেখা গেল যে, এইসব ধ্বংসাবশেষের বয়স চার থেকে পাঁচ হাজার বছর। ক্রমে ক্রমে মহোঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার আরও খননকার্য চালিয়ে নানা প্রকার জিনিস পাওয়া গেল। এর থেকে বোঝা গেল যে, এই অঞ্চলে প্রাচীন যুগে এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ হয়েছিল। কিন্তু শিলমোহর-গুলোর উপরে যে সব লেখা আছে, দুঃখের বিষয়, আজও সেগুলো পড়তে পারা যায় নি। তাই এই যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে আজও এই দুটি নগরই সিন্ধুনদের উপত্যকায় অবস্থিত বলে এই নতুন আবিষ্কৃত সভ্যতাকে বলা হয় **সিন্ধু সভ্যতা**।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা মিশরীয় ও সুমের সভ্যতার সমসাময়িক। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে বিকাশ লাভ করেছিল। সমসাময়িক মিশর ও ব্যাবিলনের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতা কেবলমাত্র তাদের সমকক্ষই ছিল না, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বরং আরও উন্নত ছিল।

নগর পরিকল্পনা : সিন্ধু সভ্যতা আসলে ছিল নাগরিক সভ্যতা। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার উন্নত নগর পরিকল্পনা দেখে

বোঝা যায় যে, পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়া এই শ্রেণীর উন্নত নগর পরিকল্পনা সম্ভব নয়। ছুটি নগরেই বেশ চওড়া রাস্তা ছিল। তার দুধারে ছিল ইটের তৈরি বাড়ি। বাড়িগুলো দুই তিন তলবিশিষ্ট ছিল। আবার তার পাশপাশি দেখা যায় দু'কামরার ছোট একতলা বাড়ি। সাধারণতঃ বাড়িগুলো তৈরি হত পোড়া ইটে। বাড়িগুলোর মেঝে ছিল পাকা। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ছিল কুয়ো, স্নানের ঘর ও নর্দমা। হরপ্পায় একটা বিশাল গোয়ালঘরের ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জো-দাড়োতে একটা প্রশস্তঃ স্নানের ঘরের ধ্বংসা-বশেষ পাওয়া গেছে। এই স্নানের ঘরটি ১৮০ ফুট লম্বা এবং ১০৮ ফুট চওড়া। মনে হয়, এটা সাধারণের জন্য তৈরি হয়েছিল। এই সব দেখে মনে হয়—শহরটিতে বহু লোক বাস করত।


মহেঞ্জোদাড়োর পয়ঃপ্রণালী

এদের মধ্যে যেমন ছিল ধনী লোক, তেমনই ছিল মধ্যবিত্ত আর গরীব। একদিকে যেমন ছিল বিরাট বিরাট অট্টালিকা ও বিলাস ব্যবস্থা, অন্যদিকে ছিল ঘিঞ্জি বস্তি।

ঘর তৈরিতে সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা অত্যন্ত পারদর্শিতা দেখিয়েছিল। এজন্য যে মাপের ইট তারা ব্যবহার করত, আজ আমরা ঠিক সেই মাপের ইট বড়িঘর তৈরির জন্য ব্যবহার করি। সিমেণ্টের বদলে কাদা এবং খড়িমাটি দিয়ে ইট গাঁথা হোতো। পয়ঃপ্রণালীগুলোর ভেতরের দিকটা তৈরি হোতো চুন ও খড়িমাটির মতো কিছু মিশিয়ে। ঘরগুলোতে যাতে প্রচুর আলোবাতাস ঢুকতে পারে, সেজন্য কাঠের

তৈরি চওড়া দরজা এবং জানালা বসানো হোতো। বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে ওঠার জন্য সিঁড়িও থাকত।

বাড়ির এবং শহরের জলনিকাশের জন্য অদ্ভুত ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির ছাদ থেকে নিচ পর্যন্ত নল লাগানো হোতো। নিচে নোংরা জল ধরার জন্য কুণ্ড থাকত। সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে নোংরা জল যাতে শহরের বাইরের চলে যেতে পারে, সেজন্য নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। নর্দমা দিয়ে এসব জল গিয়ে পড়ত বড় বড় কুণ্ডে। খাটা-পায়খানাও ব্যবহার করা হোতো ওখানে।

খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্য: মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা আমিষ ও নিরামিষ দু ধরনের খাদ্য খেত। এদের প্রধান খাদ্য ছিল গম ও যব। ফলমূল এবং খেজুরও এরা খেত। ভেড়া, শুয়োর, মুরগী প্রভৃতির মাংসও খেত এরা। টাটকা মাছ, শুটকি মাছ, শামুক, তিল, রাই, মটর প্রভৃতি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হোতো।



সিন্ধু সভ্যতার অলঙ্কার

পোশাক-পরিচ্ছদ হিসাবে সে-যুগের লোকেরা সূতী ও পশম বস্ত্রের ব্যবহার জানত। সোনা, রূপো, ব্রোঞ্জ, তামা, টিন প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহারও তারা করত, যদিও এসব জিনিস বাইরে থেকে আনা হোতো কিনা তা জানা যায় না। রূপো দিয়ে গয়না ও গয়নার বাক্স তৈরি হোতো। সীসের অনেক টুকরো পাওয়া গেলেও তা দিয়ে কি হোতো জানা যায় না। তামা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র, গয়না, বাসনপত্র তৈরি হোতো।

কুমোরের চাকের ব্যবহারও এ যুগের লোকেরা জানতেন। তা দিয়ে নানারকম মাটির পাত্র (কোনটায় আবার ছবি-আঁকা) তৈরি করা হোতো। তাছাড়া চীনামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও রূপোর পাত্রের ব্যবহারও এ যুগে দেখা যায়। কিন্তু লোহার ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেছে পোড়ামাটি, চীনামাটি ও শামুকের তৈরি সুতো কাটার মাকু, হাড় ও হাতির দাঁতের সূচ ও চিরুনি, তামা ও

বোঞ্জের তৈরি কুড়ুল, ছুরি, কাঁচি, বঁড়শি, এমনকি দাড়ি কামানোর ক্ষুর পর্যন্ত। ওজনের জন্য ব্যবহৃত হোতো চৌকো চৌকো পাথরের খণ্ড। আর পাওয়া গেছে ছোট চাকা-দেওয়া পোড়া মাটির খেলনা, গরুর গাড়ি ও নানা রকমের পশুপাখি। পাশা খেলার ঘুঁটির মত কিছু ঘুঁটিও পাওয়া গেছে। এসব থেকে মনে হয়, অবসর যাপনের জন্য বড়দের মধ্যে পাশা খেলার মত কোন খেলার প্রচলন ছিল।



মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত মূর্তি

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে কুঠার, বর্শা, গদা, ছোরা, গুলতি এবং কিছু তীরধনুক। শিরস্ত্রাণ বা ঢাল জাতীয় আত্মরক্ষামূলক কোনও জিনিসই পাওয়া যায় নি। অস্ত্রগুলো সবই আক্রমণের জন্য এবং এগুলো সবই তামা অথবা ব্রোঞ্জের তৈরি। অনেকে অনুমান করেন যে, আত্ম-রক্ষামূলক অস্ত্রের অভাবেই এই স্থানের অধিবাসীরা অক্রমণকারীদের অভিযান রুখতে না পেরে বিধ্বস্ত হয়েছিল।

শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা ঃ মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার শিলমোহর-গুলি সিন্ধু সভ্যতার এক বিশিষ্ট অবদান। চৌকো ও আয়তাকার ছোট-ছোট শিলমোহরগুলোতে দেখা যায় ষাঁড়, বাঘ, হাতি, মানুষ ও গাছপালা প্রভৃতি। এদের ঘরবাড়ি, গয়নাগাটি, অস্ত্রশস্ত্র এবং মাটির পাত্রে আঁকা ছবিগুলি দেখলেও বোঝা যায়, এরা শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। কুমোরের চাকতি, পোড়া ইট, চীনামাটি জাতীয় জিনিস, ধাতুদ্রব্য মেশানোর কৌশল প্রভৃতিও কারিগরিবিদ্যায় এদের অভূতপূর্ব অগ্রগতির কথা প্রমাণ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা নিজের দেশে এবং অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ইরাণ, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যে তাদের যোগাযোগ ছিল, তা এসব দেশের সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার মিল দেখেই স্পষ্ট বোঝা যায়। টিন, তামা, মূল্যবান পাথর প্রভৃতি জিনিস এরা বাইরে থেকে আনত। এখানে যেসব শিলমোহর পাওয়া গেছে, তাতে দাড়ি, মাঝি, পাল ও মাস্তুল দেওয়া নৌকোর ছবি রয়েছে। এতে বোঝা যায়, সমুদ্রপথে এরা বাইরের দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। উট, ঘোড়া এবং গাধার পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জিনিসপত্র নিয়ে যেত। তাছাড়া পরিবহণের জন্য গরু-মোষে টানা গাড়ি তো ছিলই।



মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার শিলমোহর

ধর্ম ঃ মহেঞ্জোদাড়োতে কোনও দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়নি। বোধ হয় এই যুগে মন্দির নির্মাণের রীতি তখনও গড়ে ওঠেনি। যদিও এ যুগের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে ষাঁড়, কুমীর, সাপ ও গাছকে পবিত্র বলে মনে করা হোতো। কিছু কিছু দেবীমূর্তি ও পশুপতি শিবের মূর্তি এখানকার ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে। দেবী মূর্তিকে ঐ যুগের মাতৃকা দেবী ও বর্তমান যুগের দুর্গা মূর্তি বলে অনেকে অনুমান করেন। একটি শিলমোহরের ছবিতে এক ধ্যানমগ্ন যোগীর ছবি দেখা যায়। তাঁর তিনটি মুখ এবং মাথার উপরে চূড়ার দু'পাশে দুটো শিং। এই যোগী মূর্তিটি পরবর্তী কালের মহাযোগী পশুপতি শিবের কথাই স্মরণ

করিয়ে দেয়। এদের মধ্যে মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করা, উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল।



পশুপতিনাথ

সমাজের শ্রেণীবিন্যাস : মহেঞ্জোদাড়োতে পাওয়া জিনিসগুলো থেকে বোঝা যায়, এখানে নানা শ্রেণীর মানুষ বাস করত। যেমন—কামার, কুমোর, তাঁতী, স্বর্ণকার, রত্নবণিক, রাজমিস্ত্রি, হাতির দাঁতের কারিগর প্রভৃতি। এখানকার বাড়িঘরগুলো দেখলে বোঝা যায়, এখানকার সমাজে সব মানুষ সমান ছিল না। একদল ছিল ধনী—তারা বিলাস-বহুল জীবনযাপন করত, আর অন্যদল ছিল গরীব—তারা থাকত কায়ক্লেশে। অর্থাৎ, সেই সময়েও সমাজে মানুষের মধ্যে সমতা ছিল না। এরা ছাড়া পুরোহিত শ্রেণীর এক ধরনের লোকও ছিল। এরকম কিছু কিছু মূর্তিও পাওয়া গেছে।

সিন্ধু সভ্যতা কোন্ অবস্থায় কেমন করে বিকাশ লাভ করেছিল এবং কেমন করেই বা তা ধ্বংস হল, তা সঠিকভাবে বলতে পারা যায় না। এই ধ্বংসের নানা কারণ পণ্ডিতেরা অনুমান করে থাকেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায় হয়ত এই অঞ্চল ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হয়। মহামারী বা বহিঃশত্রুর আক্রমণও এই উন্নত সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

অনুশীলনী

১। কিভাবে সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃত হল ?

২। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদাড়োর নগর-পরিকল্পনার বিবরণ দাও।

৩। সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা কি কি খাদ্য খেত ? কি ধরনের জিনিসপত্র তারা ব্যবহার করত ?

৪। শিল্প ও কারিগরিবিদ্যায় সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা কেমন উন্নতি লাভ করেছিল ?

৫। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার লোকেরা কিভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করত ?
৬। সিন্ধু উপত্যকার লোকেদের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল ?
৭। **দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**
(ক) সিন্ধু সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন ?
(খ) কত বছর আগে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটে ?
(গ) মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার সভ্যতাকে 'সিন্ধু সভ্যতা' বলা হয় কেন ?
(ঘ) মহেঞ্জোদাড়োতে কোন্ ধরনের অস্ত্রের অভাব ছিল ?
(ঙ) কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা বাণিজ্য করত ?
(চ) 'মহেঞ্জোদাড়ো' শব্দটির অর্থ কি ?
(ছ) কি কারণে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হল ?
৮। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**
(ক) মহেঞ্জোদাড়োর লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল — ও —।
(খ) — সিন্ধু সভ্যতার এক বিশিষ্ট অবদান।
(গ) মহেঞ্জোদাড়োতে বেশ চওড়া — ছিল।
(ঘ) নর্দমা দিয়ে জল গিয়ে পড়ত বড় বড় —।
(ঙ) পরিবহণের জন্য — টানা গাড়ি ব্যবহৃত হোতো।
(চ) মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পায় আবিষ্কৃত অস্ত্র হচ্ছে —।
(ছ) শিলমোহরগুলিতে — ছবি রয়েছে।
(জ) — বা — আক্রমণ সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ।

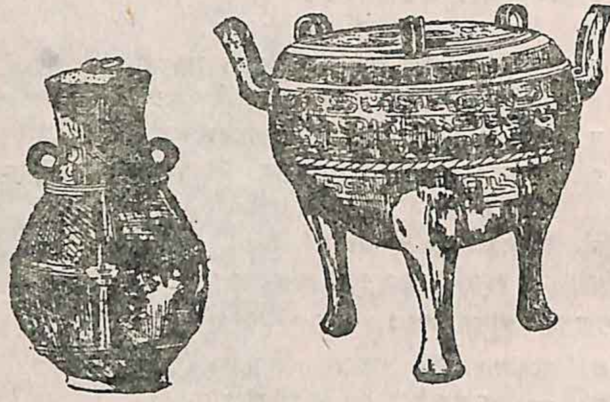
চতুর্থ অধ্যায় ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চীন

ইয়াং-সিকিয়াং এবং হোয়াং-হো হল চীনের দুটি বিখ্যাত নদী। প্রাচীনকালে যেমন মিশরীয় সভ্যতা নীল নদের ধারে, সুমের সভ্যতা টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদীর ধারে এবং সিন্ধুসভ্যতা সিন্ধু নদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল, তেমনি প্রাচীন চীন সভ্যতা ইয়াং-সিকিয়াং ও হোয়াং-হো নদীর ধারে বিকাশ লাভ করেছিল।

প্রাচীন চীন ঃ চীন অতি প্রাচীন দেশ। কিভাবে চৈনিক সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল, তা বলা কষ্টকর। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগেও হোয়াং-হো উপত্যকায় নানা উপজাতি বাস করত। এদেরই মধ্যে কেউ ছিল প্রাচীন চৈনিক মানুষ। এরা

চাষবাস করতে শিখেছিল, আর বাকি উপজাতিরা গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি জন্তু নিয়ে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই



চীনের মাটির পাত্র ও ব্রোঞ্জের পাত্র (ডানপাশে)

যাযাবররা সভ্য হতে পারে নি। কিন্তু যারা চাষবাস শিখল, তারা হোয়াংহো নদীর ধারে ঘরবাড়ি তৈরি করে সভ্য মানুষে পরিণত হয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে এরাই চীনে শহর তৈরি করতে শুরু করে এবং যাযাবরদের হাত থেকে শহরকে বাঁচাতে তার চারদিকে চওড়া পাথরের দেয়াল তুলে দেয়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে চীনের লোকেরা সুন্দর সুন্দর মৃৎপাত্র তৈরি করতে শিখেছিল। এর পর হাজার বছরের মধ্যে তারা ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করে তা দিয়ে বাসনপত্র তৈরি করে।

শুধু বাসনপত্র তৈরিতেই নয়, শিল্প এবং কারিগরি বিদ্যাতেও চীনের সে যুগের মানুষরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছিল। চাষবাসেও তাদের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। আশপাশের দেশগুলোতে নিজেদের তৈরি জিনিসপত্র তারা রপ্তানিও করত। চীনের ছবি জগৎ-বিখ্যাত। পৃথিবীর সকলেই তার তারিফ করে। সেই ছবি-আঁকার সূচনাও করেছিল প্রাচীন চীনের লোকেরা।

প্রাচীন চীনের রূপকথা ঃ চীন প্রাচীন দেশ হলে কি হবে, এর ইতিহাস লেখা হয়েছে অনেক পরে। তাই এতে অনেক আজগুবি রূপকথা স্থান পেয়েছে। চৈনিক গল্পে আছে, পৃথিবীর চারদিকে প্রথমে ছিল সীমাহীন অনন্ত জলরাশি। এই জল থেকেই তৈরি হল দুটি শক্তি—য়িন ও ইয়াং। এদের থেকেই উদ্ভব হল প্রথম মানুষের—তার

নাম 'পান্-কু'। তিনি নাকি ১৮০০০ বছর ধরে আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেন। তারপর তিনি হাতুড়ি আর ছেনি দিয়ে আকাশকে কেটে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি তৈরি করলেন। এরপর পান্-কু নিজে প্রতিদিন ছ' ফুট করে বাড়তে লাগলেন। শেষে তিনি এত প্রকাণ্ড হলেন যে, তাঁর তৈরি জগতের সঙ্গে তিনি এক হয়ে গেলেন। তাঁর মাথা হল পর্বত, নিঃশ্বাস হল কুয়াশা এবং মেঘ ও শরীরের শিরাগুলি হল নদী, আর গায়ের চামড়া এবং চুল হল গাছপালা ; তাঁর দাঁত এবং হাড়গুলো হল মাটির নিচের লুকোনো ধাতু ; তাঁর ঘাম হল বৃষ্টি এবং যে-সব কীট তাঁর দেহে ঘুরে বেড়াত, তারাই হল মানুষ। এইভাবে মৃত্যুর পর পান্-কু সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়লেন।

পান্-কুর পৃথিবী সৃষ্টির কয়েক লক্ষ বছর পরে পৃথিবীতে স্বর্গ থেকে পাঁচজন সম্রাট আসেন। প্রথম সম্রাট দেশের মধ্যে লেখাপড়া, ছবি আঁকা, সঙ্গীত, পশুপালন, জাল নিয়ে মাছ ধরা, রেশম থেকে সুতো তৈরি করা ইত্যাদি বিদ্যার প্রচলন করেন। পরবর্তী সম্রাট শিক্ষা দেন কৃষিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি। তিনিই প্রথম কাঠের লাঙ্গলের প্রচলন করেন। তৃতীয় সম্রাট আবিষ্কার করেন চুম্বক এবং ইটের বাড়ি নির্মাণের কৌশল। ইনি পঞ্জিকার সংস্কার করেন। গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করার ব্যবস্থাও তিনি করেন। চতুর্থ সম্রাট চীনের ধর্মাবতার। তাঁর বিচার ব্যবস্থা খুব ভাল ছিল। পঞ্চম সম্রাট পঞ্জিকা আরও সংস্কার ও পরিমাপ যন্ত্রের উন্নতি বিধান করেন। তিনি শেষ বয়সে 'য়ু' নামক এক ব্যক্তিকে সিংহাসন দান করেন।


হরিণের শিংয়ের উপর চীনের প্রথম লেখা

পাঁচজন সম্রাটের এই রূপক গল্পের মধ্যে দিয়ে চীনের লোকেরা বলতে চায়, তারা পুরাতন প্রস্তর যুগ বা নতুন প্রস্তর যুগের মানুষদের মত অসভ্য কোন কালেই ছিল না। কিন্তু এ কথা সত্যি নয়। কারণ, চীনেও মানুষের হাতে-গড়া পাথরের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে। এমন প্রমাণও পাওয়া

গেছে, যাতে জানা যায়, ধাতুযুগ শুরু করার আগে চীনের লোকেরা ঠিক অন্যান্য দেশের আদিম মানুষদের মত আচরণ করত এবং ঐ রকম জিনিসপত্র ব্যবহার করত।

অনুশীলনী

১। বিভিন্ন দিকে প্রাচীন লোকেদের অগ্রগতির পরিচয় দাও।
২। পান্-কু কে? কিভাবে মৃত্যুর পর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছড়িয়ে পড়লেন?
৩। পাঁচ জন সম্রাট কিভাবে চীনকে উন্নত করেন?
৪। **দু'-এক কথায় উত্তর দাও:**
(ক) চীনের বিখ্যাত নদী দুটির নাম কি?
(খ) রূপক গল্পের মধ্য দিয়ে চীনেরা কি বলতে চায়?
(গ) 'য়ু' কে?

চতুর্থ অধ্যায়: পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নদীমাতৃক সভ্যতা

মানুষের সভ্যতার ইতিহাস যদি আমরা বিচার করে দেখি, তাহলে দেখব যে, সভ্যতার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল বাঁচার তাগিদে। নিজেকে বাঁচাতেই মানুষ একদিন হিংস্র বন্য জন্তুদের মারার জন্য পাথরের চাঁইকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে শিখেছিল, তারপর সেই অস্ত্রকে ঘষেমেজে মসৃণ ও ধারালো করেছিল। কিন্তু সেটা ছিল সভ্যতার অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়। মানুষের সভ্যতা প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল যখন, মানুষ স্থায়িভাবে কোথাও ঘর বেঁধে বাস করতে শিখল তখন।

আগে মানুষ চাষবাস জানত না। তাই ঘর বাঁধার দরকারও তার ছিল না। তখন সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াত, বনের গাছ থেকে ফলমূল কুড়িয়ে খেত, প্রয়োজন হলে পশু শিকার করত, রাত্রে হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাহাড়ের গুহায় থাকত। কিন্তু যেদিন মানুষ চাষবাস শিখল, সেদিন অবস্থাটা গেল পালটে। এবার চাষের জমির কাছে মানুষের স্থায়িভাবে বাস করার প্রয়োজন দেখা দিল।

মানুষ প্রথম স্থায়িভাবে ঘর বাঁধতে শিখল নদীর ধারে। কোথাও বা হ্রদের ধারে। নদীর ধারে এভাবে বাসস্থান গড়ার পেছনে যথেষ্ট

কারণ ছিল। জল না হলে মানুষ বাঁচে না। শুধু মানুষ কেন, জীবজন্তুরাও বাঁচে না। সেজন্য অরণ্যের পশুরাও ঝর্ণা, হ্রদ বা নদীর ধারে কাছে থাকে। কিন্তু শুধু পানীয় জলই নদীর ধারে মানুষের বাসস্থান গড়ার কারণ নয়। বর্ষাকালে নদীতে বন্যা দেখা দেয়। নদীর জল দুকূল ছাপিয়ে এসে পড়ে নদীর দু পাশের জমিতে। নদীর দুই তীরের সাময়িক ক্ষতি হলেও পরিণাম কিন্তু ভালো হয়। বন্যা হলে নদীর দু' তীরে পলিমাটি পড়ে, মাটি তাতে উর্বর হয়। মাটি উর্বর হলে শস্য ভালো হয়। এভাবে ফলন ভালো হতে দেখেই মানুষ প্রথম ঘর বাঁধে নদীর ধারে।

প্রথম নদীর ধারে ঘর বেঁধেছিল কিছু মানুষ। তাদের দেখে এল অন্যেরা। এভাবে ধীরে ধীরে নদীর ধারে গড়ে ওঠে ঘন বসতি। প্রথমে এসেছিল ছোট ছোট কতকগুলি পরিবার, পরে পরিবারগুলি মিলে গড়ে উঠল ছোট ছোট জনপদ। এই ছোট ছোট জনপদ থেকেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হল রাজ্য। এভাবে পৃথিবীর সব দেশেই নদীর ধারে বা নদীর উপত্যকাতে গড়ে উঠল সভ্যতা।

পৃথিবীর দেশে দেশে নদীর ধারে এই যে নদীমাতৃক সভ্যতা গড়ে উঠল, নানা দিক দিয়ে এসব সভ্যতার মধ্যে একটা মিল দেখা যায়। যেমন, সর্বত্রই মানুষ চাষবাসের জন্য প্রকৃতি যাতে বিমুখ না হয়, সেজন্য দেবদেবীর পুজো করেছে। দেবদেবীর পুজো হোতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। সেই জায়গা বা মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ঘরবাড়ি, তৈরি হয়েছে জনপদ। ধীরে ধীরে জনপদ বড় হয়েছে; তৈরি হয়েছে শহর।

শহর তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে ভাবতে হয়েছে অনেকটা। প্রথমতঃ, তখনও অনেক মানুষ ছিল যাযাবর। তারা বিভিন্ন সময়ে শহরের দিকে এসে শহর আক্রমণ করে শহর ধ্বংস করত। সুতরাং এদের হাত থেকে শহরকে বাঁচানোর কথা জনপদবাসী মানুষকে ভাবতে হয়েছে। অনেক ভাবনার পর শহরের চারদিকে তারা তুলেছে দেয়াল। নদীর ধারে থাকলে প্লাবনের ভয় আছে। তাই নদীতে বাঁধ দিয়ে শহর বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছে। নদী

বর্ষার সময়ে দুকূল ভাসায়, কিন্তু অন্য সময়ে চাষের ক্ষেতে জল কম পড়ে। তাই সারা বছর ক্ষেতে যাতে জল পাওয়া যায়, সেজন্য মানুষ খাল খনন করেছে। আবার, নদীর ধারে পলিমাটি পর্যাপ্ত। কোথাও কোথাও বা সূর্যের প্রখর তেজ। তাই মাটি দিয়ে মানুষ আগুনে পোড়া বা রোদে শুকানো ইট তৈরি করেছে। সেই ইট দিয়ে তৈরি হয়েছে শহরের ঘরবাড়ি ; মাটি দিয়ে তৈরি করেছে বাসনপত্র, খেলনা, সখের জিনিসপত্র। শিল্পবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে মানুষের মধ্যে। মানুষ মূর্তি তৈরি করতে শিখেছে, ছবি এঁকেছে।

মানুষ একত্রে বাস করলেই শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নেতার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক পরিবারের নেতা অপর পরিবারগুলির নেতাদের জয় করে উপজাতি তৈরি করেছে। আবার কোন শক্তিশালী উপজাতির নেতা অন্যান্য উপজাতিদের জয় করে একটা জনপদের শাসক হয়েছে। এভাবে বড় বড় রাজবংশ দেখা দিয়েছে। কিন্তু শুধু রাজাকে পেলেই তখনকার মানুষের চলে নি। মানুষ তখন অজানাকেই ভয় করত বেশি। ভাবত, অদৃশ্য দেবদেবীরা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। তাই দেবমন্দিরে পুজো করার জন্য দেখা দিয়েছে পুরোহিতশ্রেণী। এদের সঙ্গে দেবতাদের যোগাযোগ রয়েছে বলে সেকালের মানুষ ভাবত। এই কারণে রাজার মত পুরোহিতদেরও কদর বেড়েছে। ইতিমধ্যে চাষবাসের উন্নতি করার প্রয়াসে মানুষ প্রস্তর যুগ থেকে ধাতুযুগে এসে পৌছেচে। সর্বত্রই প্রথমে তামা এবং তারপর ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা দিয়েছে। মূল্যবান ধাতু ও পাথরের গয়না তৈরি করেছে মানুষ। তারপর লোহা আবিষ্কৃত হবার পর থেকে মানুষের সভ্যতার চরিত্রই গেছে পালটে।

নদীকে কেন্দ্র করে এই যে সভ্যতা গড়ে উঠল, তাতে এক বিরাট পরিবর্তন এল—যখন মানুষের মনে ব্যবসাবুদ্ধি দেখা দিল। আগে মানুষের মনে এই বুদ্ধিটা ছিল না। ক্রমে শুরু হল বিনিময়ের কারবার। চাষবাস-করা মানুষদের কাছ থেকে জিনিসপত্র নিত যাযাবরেরা। এর বিনিময়ে যাযাবরেরা ওদের দিত নিজেদের গরু, ভেড়া প্রভৃতি জন্তু। এসব জন্তুরা হতো চাষবাস-করা মানুষের গৃহপালিত পশু। পশুকে গৃহে পালন করতে শেখাও নিঃসন্দেহে মানুষের একটা বড় কৃতিত্ব।

আগে মানুষ উৎপাদন করত শুধু নিজের জন্য। ব্যবসা-বুদ্ধি জন্মালে মানুষ আরও বেশি করে উৎপাদনের দিকে ঝুঁকল। কারণ উৎপাদন যত বেশি হবে, বিনিময়ে আরও বেশি অন্য জিনিস পাওয়া যাবে। এজন্য অনেক দেশেই উৎপাদন বাড়াবার জন্য যুদ্ধবন্দীদের ভৃত্য করে রাখা হতে লাগল। এদের দিয়ে চাষ করানো হোতো, খাল কাটানো হোতো, বাঁধ তৈরি করানো হোতো। উৎপাদন বাড়লে কিন্তু ভৃত্যদের নিজের লাভ কিছুই হোতো না, লাভটা হোতো মনিবদের।

ব্যবসাবুদ্ধি হবার পর থেকেই সমাজে পেশা অনুসারে এক-একটা শ্রেণী গড়ে ওঠে। আগে পরিবারের জন্য যা যা প্রয়োজন, তার সব কিছুই তৈরি করতে হোতো পরিবারের লোকদের। কিন্তু এবার চাষী, কামার, কুমোর, স্বর্ণকার, তাঁতী, কুম্ভকার, রাজমিস্ত্রি, ব্যবসায়ী প্রভৃতির শ্রেণী দেখা দিল। যে যে ধরনের কাজ করত, সে ঠিক সেই ধরনের কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। চাষী চাষবাস করত, সে মাটির জিনিস তৈরি করত না ; মাটির জিনিসের দরকার পড়লে তাকে যেতে হোতো কুম্ভকারের কাছে। রাজমিস্ত্রি বাড়ি তৈরি করত, কিন্তু চাষবাস করত না। এভাবে সমাজে কাজের ভিত্তিতে আপনা থেকেই একটা শ্রেণীভেদ দেখা দিল।

আর এক দিক দিয়েও সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দিল। চাষী, যারা চাষবাস করত, তারা জানত যে, বছরের সব সময় চাষবাসের অনুকূল থাকে না, তাই যথাসময়ে চাষের কাজ সেরে নেবার জন্য তারা সবাই মিলে কাজ করত। এভাবে চাষ নিয়েই ব্যস্ত থাকত তারা, তাদের আর লেখাপড়া শেখার সময় দেওয়া হোতো না। অন্যান্য পেশার কারিগর-দেরও হল সেই এক অবস্থা। তারা নিজেদের পেশা নিয়েই মেতে রইল, লেখাপড়া করার সুযোগ আর পেল না। যারা থাকত রাজার পাশে পাশে, যারা যুদ্ধ করত, দেশরক্ষা করত, তারা অনেক সময় গায়ের জোরে এসব লোককে দিয়ে নিজেদের কাজ করিয়ে নিত। ফলে একদল গড়ে উঠতে থাকে অভিজাত ও লেখাপড়া জানা হিসেবে, আর একদল হতে থাকে মূর্খ ও গরীব। মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু উপত্যকা— প্রভৃতি সব জায়গাতেই সেই প্রাচীন যুগেও যে নানা বৃত্তির মানুষ

ছিল, ধনী-দরিদ্র ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ওখানকার ঘরবাড়ির আয়তন, দেয়ালচিত্র প্রভৃতি দেখলে।

নদীতীরের সভ্যতার সর্বত্রই দেখা যায়, লোকগুলো লিখতে জানত। কারো লিপি ছিল চিত্রে, কারো বা কীলকে। তবে মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু উপত্যকা—সর্বত্রই লেখা শুরু হয়েছিল চিত্র দিয়ে। মানুষের এই লিখতে শেখার পেছনে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসায়িক হিসেব রাখার প্রয়োজনেই নাকি মানুষ প্রথম লিপির সন্ধান করে। কিন্তু সেটা যে প্রয়োজনেই হোক, লিপি আবিষ্কার যে মানুষের অসীম উপকারে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই নদীতীরবাসী মানুষরা সকলেই খুব প্রাচীন কাল থেকেই নৌকোর ব্যবহার জানত। নৌকো দিয়ে তারা দূর দূর দেশে বাণিজ্য করতে যেত। এদের মধ্যে অনেকেই চাকাওয়ালা গাড়ি আবিষ্কার করেছিল। গাধার পিঠেও তারা মাল বহন করত। এভাবে সর্বত্রই নদীমাতৃক সভ্যতার প্রকৃতি ছিল একই রকম। যতটুকু পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তা হয়েছিল পরিবেশের জন্য ; যেমন,—মিশরে পাথর পাওয়া যেত, তাই মিশরীয়রা পাথর ব্যবহার করত ; মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকায় পাথর ছিল না, ওখানে কাজ হোতো আগুনে পোড়া বা রোদে সেঁকা ইট দিয়ে। এই প্রাকৃতিক কারণের পার্থক্য ছাড়া সর্বত্রই সভ্যতার চেহারা ছিল একই রকমের।

অনুশীলনী

১। বড় বড় রাজবংশ কিভাবে দেখা দিয়েছে ? কিভাবে পুরোহিতদের ক্ষমতা বেড়েছে ?

২। মানুষের মনে ব্যবসাবুদ্ধি দেখা দেবার পর থেকে সমাজে কি কি পরিবর্তন ঘটল ?

৩। সমাজে ধনী-দরিদ্র দেখা দিল কিভাবে ?

৪। **দু'-এক কথায় উত্তর দাওঃ**

(ক) মানুষ কোথায় প্রথম ঘর বাঁধতে শিখল ?

(খ) প্রাচীন সভ্যতার মানুষদের নেতার প্রয়োজন কেন হ'ল ?

(গ) নদীমাতৃক সভ্যতার মানুষদের মধ্যে শ্রেণী গড়ে উঠল কেন ?

লৌহ যুগের সমাজ

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার ঃ অনেক সময় অন্ধকার রাতে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়—একটা জ্বলজ্বলে গোলা সোঁ করে নিচে পড়ে গেল। মনে হবে আকাশ থেকে বুঝি তারা খসে পড়ল। কিন্তু এর নাম উল্কা। আকাশ থেকে যে-সব উল্কা মাটিতে পড়ে, সেগুলো লোহা ও পাথর মেশানো শক্ত ঢেলা বিশেষ। আদিম মানুষ এই উল্কা থেকেই প্রথম লোহার সন্ধান পেয়েছিল। তাই তারা লোহার নাম দিয়েছিল আকাশ-ধাতু। ব্রোঞ্জ যুগের পর মানুষ লোহা আবিষ্কার করে। লোহার আবিষ্কার মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করল। বলা যায়, আগুন আর লোহা মানুষকে আজ পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের অধিকারী করেছে। লোহা হল ধাতুর রাজা।

অবশ্য, অনুমান করা যায় যে, লোহা আবিষ্কার করেও প্রথমে মানুষ একটু অসুবিধেয় পড়েছিল। এমন শক্ত ধাতু দিয়ে কী করে দরকারমত জিনিস বানাবে ? তাদের হাতুড়ি ছিল না। হাতুড়ির কাজ চলত ভারী পাথর দিয়ে। ক্রমে হাতলওয়ালা হাতুড়ি তৈরি করে মানুষ সেই অসুবিধা দূর করল। **'হিটাইটস্'** নামে এক জাতি সর্বপ্রথমে লোহার খনির সন্ধান পেয়েছিল। এশিয়া-মাইনরের পাহাড়ে তারা বাস করত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে ওরাই সর্বপ্রথম লোহা দিয়ে ছুরি, বাটালি, বর্শা, কুড়ুল ইত্যাদি বানিয়েছিল। তাই হিটাইট্‌স্‌দের আমরা আদি যুগের কামার বলতে পারি। হিটাইটস্ জাতি একটা রাজ্য গড়েছিল—এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। সেই রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবার পর এই কামারের দল ছড়িয়ে পড়ে নানা দেশে। লোহার জিনিস ওরাই দেশে-বিদেশে চালু করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে লোহা আবিষ্কারের গুরুত্ব ঃ লোহার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই চাষবাসের ক্ষেত্রে বিরাট

এক পরিবর্তন দেখা যায়। কারিগরি বিদ্যাতেও মানুষের উন্নতি হয়। সমাজে দেখা দেয় কামার শ্রেণীর। কুমোরের জন্য আবিষ্কৃত হয় চাক, তাঁতীর জন্য তাঁত বোনার যন্ত্র। এভাবে লোহা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষ যে কাজ ভালো জানত, অন্য কাজ বাদ দিয়ে সে সেই কাজই করতে শুরু করল। এভাবে তাঁতী কেবল তাঁতই বুনত, মাঠে চাষ করতে যেত না; কুমোর মাটির জিনিসপত্রই তৈরি করত, লোহার জিনিসপত্র বানাত না। সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগটা এবার আরও পাকাপোক্ত হল।

এই লৌহ যুগেই জোরালোভাবে দেখা দিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। মানুষের প্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়েছিল গবাদি পশু এবং যুদ্ধবন্দী দাস। ধীরে ধীরে জমিজমাকেও ব্যক্তিগত সম্পত্তির পর্যায়ে ধরা হতে থাকে। মানুষে মানুষে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পার্থক্য অনুযায়ী সমাজে দেখা দিল দুই শ্রেণী: ধনী আর দরিদ্র। যারা শস্য বেশী ফলিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়াল, তারা হল ধনী, আর যারা তা পারল না, তারা হল দরিদ্র। ধনীদের মধ্যে যাদের হাতে এল ক্ষমতা এবং সবচেয়ে বেশী ধনসম্পদ, দাস ও যন্ত্রপাতি, তারা পরিচিত হল অভিজাত বলে। অভিজাতরাই হল সমাজের মুকুটমণি। তারাই হল সমাজের নেতা। তারা নিজেরা কাজ করত না, অপরকে দিয়ে কাজ করাত। এরা সংখ্যায় ছিল মুষ্টিমেয়। অন্যদিকে রইল দাস, চাষী, কারিগর প্রভৃতি। সমাজে এরাই সংখ্যায় ছিল ভারী, কিন্তু এদের নিজের বলতে কিছুই ছিল না। এরা ধনী বা অভিজাতদের অধীনে থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল।

রাজতন্ত্রের উদ্ভব: লৌহযুগ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিকেও পরিবর্তন দেখা দিল। লোহার হাতিয়ারের সাহায্যে শক্তিশালী গোষ্ঠীরা ব্রোঞ্জ বা তামার অস্ত্র ব্যবহারকারী গোষ্ঠীদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী হয়ে পড়ল। তার ফলে সহজেই তারা ওদের পরাজিত করে তাদের দেশ অধিকার করে নিতে লাগল। এইভাবে প্রাচীন পৃথিবীতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সূচনা হল।

শক্তিশালী গোষ্ঠীরা যতই দুর্বল গোষ্ঠীদের পরাজিত করে তাদের

দেশ কেড়ে নিতে লাগল, ততই গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতাও বাড়তে লাগল। তাছাড়া যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকদের অবশ্যই গোষ্ঠীপতিকে মেনে চলতে হোতো। এভাবে লৌহ যুগে গোষ্ঠীপতি বা রাজার ক্ষমতা ক্রমে বেড়ে উঠল। দেশ জয় করে যে-সব জিনিস লুঠ করে আনা হোতো, তার অধিকাংশই রাজার অধিকারে থাকত। এভাবে রাজা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হলেন। রাজার আত্মীয়-স্বজনরাও সমাজে বিশেষ শক্তিশালী হলেন। নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য রাজা নানারকম আইন, বিচারক, কারাগার ইত্যাদির প্রবর্তন করলেন। বিজিত দেশের লোকদের ক্রীতদাস হিসাবে ব্যবহারের প্রথাও দেখা দিল। এরাই করতে লাগল যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ। আর, সমাজের ওপর তলার লোকেরা বিলাসী ও অলস হয়ে পড়তে লাগলেন। এভাবে যে সমাজ এককালে ছিল রক্তের সম্পর্কে যুক্ত, পরিবারের সম্পর্কে যুক্ত, এখন তার বদলে দেখা দিল এক নতুন ধরনের সমাজ, যাকে বলা যায় রাষ্ট্র।

অনুশীলনী

১। আদিম মানুষ কিভাবে লোহার সন্ধান পেয়েছিল ?

২। হিটাইট্‌স্ কারা ? কোথায় তারা বাস করত ? তারা কি করেছিল ?

৩। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে লোহার আবিষ্কারের গুরুত্ব কি ?

৪। কিভাবে সমাজে ধনী দরিদ্রের সৃষ্টি হল ? রাজতন্ত্রের উদ্ভব হল কিভাবে ?

পঞ্চম অধ্যায় : প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) ব্যাবিলন

মেসোপটেমিয়াতে সুমেরীয় সভ্যতার কথা আমরা আগেই পড়েছি। সুমেরীয়রা অত্যন্ত সভ্য জাতি ছিল, কিন্তু তাদের দেশ ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। রাজ্যগুলির মধ্যে এতটুকু সদ্ভাব ছিল না। মেসোপটেমিয়ার মধ্য এবং উত্তর-পশ্চিম অংশে সেমেটিক জাতীয় উপজাতিরা বাস করত। তাদের মধ্যে একটি জাতির নাম ছিল আক্কাড। আক্কাড-নেতা প্রথম সারগন ছিলেন শক্তিশালী সমর-নায়ক।

এক সময় তিনি বাহুবলে সমগ্র মেসোপটেমিয়া জয় করে দেশটিকে নিজের অধীনে আনেন। শুধু মেসোপটেমিয়াই নয়, পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল তাঁর শাসনাধীনে আসে।

প্রথম সারগনের বংশধররা ছিলেন খুবই দুর্বল। এত বড় সাম্রাজ্যকে দখলে রাখার ক্ষমতা তাঁদের কারুরই ছিল না। রাজার রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা না থাকলে রাজ্যে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা, আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই বহিঃশত্রু দেশ আক্রমণ করে। এক্ষেত্রেও তাই হল। মেসোপটেমিয়ায় বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে অ্যামোরাইট এবং এলামাইট নামে দুই জাতি ঐ দেশ আক্রমণ করল। অ্যামোরাইটরা দখল করল আক্কাড, আর এলামাইটরা দখল করল সুমের। প্রথমে এই দুই জাতি নিজেদের দখল-করা জায়গা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুই জাতির মধ্যে বিবাদ বাধে। যুদ্ধে অ্যামোরাইটরা হারিয়ে দেয় এলামাইটদের। অ্যামোরাইটরা ব্যাবিলনে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করে। 'ব্যাবিলন' নামটি থেকেই এই সাম্রাজ্যের নাম হয় ব্যবিলনীয় সাম্রাজ্য।

অ্যামোরাইট শাসকদের বিচক্ষণতায় কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবিলন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়ায়। অ্যামোরাইট রাজাদের মধ্যে রাজা হামুরাবির নাম বিখ্যাত। তাঁর রাজত্বকালে ব্যাবিলনের সভ্যতা তুঙ্গে উঠেছিল।

কৃষি ও বাণিজ্য ঃ ব্যাবিলনীয়রা ব্যবসায়ী হিসাবে খুব প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ-বিদেশের সঙ্গে তারা বাণিজ্য করত। এই বাণিজ্যের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে, রাজা হামুরাবি একটি নির্দেশ জারি করে ইউফ্রেতিস নদীকে সব সময় বাধামুক্ত রাখতে বলেছিলেন। নদীপথে বাণিজ্য করতে ব্যবসায়ীদের যাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কৃষিকাজেও ব্যাবিলনীয়রা খুব দক্ষ ছিল। গম, যব, বাজরা প্রভৃতি শস্য ওখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতো।

কৃষিকাজের দিকে ব্যাবিলনীয়রা এত বেশি নজর দিত যে, এক সময় মঠ-মন্দিরের চেয়েও জমিজমার দিকে দৃষ্টি দেওয়াকে তারা পবিত্র কাজ বলে মনে করত। দেবতা মারডুক নিজে ব্যাবিলনে জলসেচের

ব্যবস্থা করেছিলেন বলে গল্প আছে। ব্যাবিলনের প্রত্যেক রাজাই খাল খনন বা সংস্কারকার্য করেছেন বলে দাবী করতেন। খাল খনন বা খাল সংস্কার করা ছিল ব্যাবিলনীয় শাসকদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র কাজ। ভালো জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে শস্য হোতো প্রচুর। শস্য বেশি হলে রাজস্ব বেশি পাওয়া যেত। আর, প্রজারা রাজস্ব দিত উৎপন্ন শস্য দিয়েই।

ব্যাবিলনের বেশির ভাগ জমিরই মালিক ছিলেন রাজা এবং পুরোহিতগণ। কিছু জমির মালিক ছিলেন স্বাধীন মানুষেরা। শস্য উৎপাদনের কাজ করানো হোতো দাস এবং স্বাধীন শ্রমিকদের দিয়ে। এই স্বাধীন শ্রমিকদের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। সারাদিন পরিশ্রম করে তারা ঠিক একদিনের উপযোগী খাবার পেত। ফলে কোনদিন কাজ করতে না পারলেই সেদিন তাদের ভাগ্যে জুটত অনাহার। এর চেয়ে বরং দাসদের অবস্থা ছিল ভালো। তাদের খাবার কোনরূপ চিন্তা ছিল না। মনিবের কাছ থেকেই তারা খাওয়া-পরা পেত।

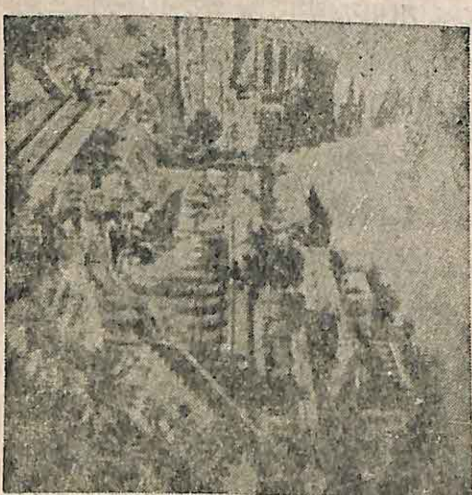
মন্দির এবং পুরোহিত : ব্যাবিলনবাসীরা ছিল প্রচণ্ড ধর্মপ্রবণ। সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, যাই তারা করুক না কেন, সব কিছুতেই ধর্মের প্রভাব ছিল ভীষণ। **মারডুক, সামাস, ইসতার** প্রভৃতি ছিলেন ওদের প্রধান দেবদেবী। এঁরা ছাড়া লৌকিক নানা দেবদেবী তো ছিলেনই। এসব দেবদেবীর নামে ব্যাবিলনীয়রা নানা মন্দির তৈরি করেছিল। এগুলোর মধ্যে ব্যাবিলনে ইসতার গেটের ভগ্নাবশেষ এবং ই-সাগিলাতে মারডুক দেবের মন্দির আজও বিস্ময় উৎপাদন করে।

ব্যাবিলনে এসব মন্দির দেখাশোনা করতেন পুরোহিতগণ। মন্দিরের নামে থাকত অনেক জমি। সেই জমিও ভোগ করতেন পুরোহিতগণই। এঁরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। এঁদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে, তাঁদের অনুমোদন ছাড়া রাজারাও সিংহাসনে থাকতে পারতেন না। এক ব্যাবিলনীয় রাজা পুরোহিতদের এই প্রভাব মানতে চান নি। তিনি বেল-মারডুকের মূর্তি সরিয়ে ফেলেছিলেন ; তাই তাঁর এক পুত্র তাঁকে হত্যা করেন। পরে যিনি রাজা হন, তিনি বেল-মারডুকের মূর্তি ফিরিয়ে এনে যথাস্থানে তা বসিয়ে নতুন করে একটি মন্দির তৈরি করে দেন।

এই ঘটনাই প্রমাণ করে,—বেল-মারডুকের পুরোহিতদের ক্ষমতা কি ছিল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতিঃ প্রাচীন ব্যাবিলন ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। সেখানকার পুরোহিতগণ অত্যন্ত ক্ষমতালোভী হলেও, তাঁদের জন্যই ব্যাবিলনে জ্ঞান-বিজ্ঞান্ চর্চার প্রসার ঘটে। মন্দিরগুলো ছিল সেকালের শিক্ষাকেন্দ্র। পুরোহিতরা সেখানে নিজেরা যেমন জ্ঞানচর্চা করতেন, তেমনই অন্যদের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন ব্যাবিলনে বিজ্ঞানের যে চর্চা হোতো, তা ছিল কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত। ব্যাবিলনে গণনা-পদ্ধতি ছিল। ভগ্নাংশ, বর্গমূল, বর্গফল ও ঘনফল—গণিতের চারটি তত্ত্বে ব্যাবিলনীয়গণ বিখ্যাত ছিলেন। জ্যোতির্বিদ্যাতেও তাঁরা উন্নতির স্বাক্ষর রাখেন। তাঁরা সূর্যের চারদিকে ভ্রমণরত পাঁচটি গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। চাঁদের পরিক্রমা দেখে তাঁরা পঞ্জিকা তৈরি করেছিলেন। সেই পঞ্জিকা বছর, মাস ও দিনে বিভক্ত ছিল। তবে, ব্যাবিলনীয়দের দিনের হিসেব ঠিক আমাদের মত ছিল না। তারা বারো ঘণ্টায় দিন এবং ত্রিশ মিনিটে ঘণ্টার হিসেব করত।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সাহিত্যের বেশ কিছু অংশ আজও পর্যন্ত টিঁকে আছে। এদের মহাকাব্যের নাম ছিল **'গিলগামেশ'**।



ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

এই মহাকাব্যেই প্রথম মহাপ্লাবনের গল্প দেওয়া আছে। স্থাপত্য এবং শিল্পেও তারা খুব উন্নতি করেছিল। ব্যাবিলনের বিখ্যাত রাজা দ্বিতীয় নে বু কা ড নে জা র খিলানের পর খিলান তুলে এক আশ্চর্য বাগান তৈরি করেন। এটিই ব্যাবিলনের বিখ্যাত **শূন্যোদ্যান**।

রাজা হামুরাবির আইনবিধিঃ ব্যাবিলনের শ্রেষ্ঠ রাজা হলেন

হামুরাবি। তিনি যে বিরাট অঞ্চল জয় করে বিস্তীর্ণ এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তাই নয়, দক্ষ শাসক হিসেবেও তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল—দেশের জন্য আইন রচনা। একটা আট ফুট লম্বা গোল পাথরের উপর তিনি তাঁর আইনগুলি খোদাই করে রাখেন। আইনের সাহায্যে দেশে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে হামুরাবি সভ্যতার ইতিহাসকে এক নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

হামুরাবির আইনবিধিতে বিধবা, অনাথ ও দরিদ্রদের সুবিচারের ব্যবস্থা ছিল। ঘুষ নেওয়ার শাস্তি, খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও হামুরাবির আইনে নির্দেশ দেওয়া আছে। শাস্তির নীতি ছিল ঃ **চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত**। কেউ যদি কারুর মাথা ফাটিয়ে দিত, তবে বিচারে অপরাধীরও মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হোতো। কোন বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে যদি কোন গৃহীর ছেলে মারা যেত, তাহলে হামুরাবির আইনে বিধান ছিল—রাজমিস্ত্রির ছেলেকেও মেরে ফেলা হবে। এটাই ছিল সে যুগের ন্যায়বিচার।

সেকালের সমাজ ঃ হামুরাবির আইনবিধি থেকে সেকালের ব্যাবিলনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। এর থেকে জানা যায়—সমাজে তিন শ্রেণীর মানুষ ছিল ঃ শাসকশ্রেণী ও তাঁদের কর্মচারিবৃন্দ, মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দাস। দাসদের অধিকাংশই দাস হোতো ঋণ নিয়ে—তা শোধ করতে না-পারার জন্য। কেউ যদি ঋণ শোধ করতে না পারত, তাহলে নিজের বা পুত্রদের শ্রম দিয়ে তা পরিশোধ করতে বাধ্য হোতো। এরকম শ্রম হয়ত সারাজীবন চলত। তবে, হামুরাবি এরকম শ্রমের সময়সীমা কমিয়ে তিন বছর করে দেন।

সেই সময়ে ব্যাবিলনে ব্যবসা, চাষবাস, খাল-খনন, জলসেচ, মুদ্রা প্রভৃতির উপর খুব নজর দেওয়া হোতো। জমির মালিক, পুরোহিত ও ব্যবসায়ীদের দিকেও খুব নজর রাখা হোতো। পুরোহিত ও রাজগণ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

(খ) মিশর

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৩২০০ বছর আগে মেনেস নামক এক

ফ্যারাও সমগ্র মিশরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তার পরেই মিশর খুব শক্তিশালী রাজ্য হয়ে দেখা দেয়।

মিশরের ইতিহাস তিন ভাগে বিভক্ত: আদি, মধ্য ও নব রাজ্য। আদি রাজ্যের ফ্যারাওরা খুব শক্তিশালী ছিলেন। তাঁরা উর্ধ্ব ও নিম্ন মিশরের রাজা হিসেবে দুটো রাজমুকুট পরতেন। একটি ছিল সাদা রংয়ের, আর একটি লাল। আদি রাজ্যের ফ্যারাওরা সিনাই উপদ্বীপ এবং নুবিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। এর ফলে প্রচুর ধনসম্পদ ও বহু যুদ্ধবন্দীকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। বন্দীদের মধ্যে অনেককে মেরে ফেলা হয়, আবার অনেককে দাস করে রাখা হয়েছিল। পিরামিড তৈরির কাজে এই দাসদের কাজে লাগানো হয়েছিল।

আদি রাজত্বের শেষে মিশরের ফ্যারাওরা দুর্বল হয়ে পড়তে থাকেন। এই সময় মিশরের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু' হাজার বছর আগে মধ্য রাজত্বের সময় সমগ্র মিশর আবার ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরিতে মিশর খুব উন্নতি করেছিল। মিশরের জলসেচ ব্যবস্থাও খুব উন্নতি লাভ করে। কিন্তু চাষীদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না; তারা খুবই দরিদ্র হয়ে পড়ে। এই কারণে চাষী, কারিগর এবং দাসরা শাসকদের বিরুদ্ধে খুব বড় ধরনের বিদ্রোহ করে। ফলে ফ্যারাওরা দুর্বল হয়ে পড়েন। রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সুযোগে **হিকসস** নামে এক যাযাবর জাতি মিশর আক্রমণ করে মিশর অধিকার করে নেয়। এরা প্রায় দু'শো বছর মিশর শাসন করে। কিন্তু এরা খুব অত্যাচারী ছিল; তাই মিশরীয়রা স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করে। তখন হিকসসদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মিশরে নব রাজত্ব শুরু হয়।

নব রাজত্বের সময়ে মিশরীয়রা খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ফ্যারাও প্রথম আহ্‌মোজ হিকসসদের হাত থেকে মিশরকে মুক্ত করেন। তিনি নুবিয়া সহ অন্যান্য দেশও আক্রমণ করেন।

তবে মিশরে নব রাজত্বের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তৃতীয় থুত্‌মোস। তিনি সতরো বার এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান

চালিয়েছিলেন এবং সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, লিবিয়া ও নুবিয়া জয় করেছিলেন। তীরধনুক ও বর্শা হাতে তাঁর এক বিরাট পদাতিক বাহিনী ছিল। এদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করত অশ্বারোহী বাহিনী।

তৃতীয় থুত্‌মোস নানা দেশ জয় করে প্রচুর ধনসম্পদ, দাস ও গবাদি পশু সংগ্রহ করেছিলেন। নানা মন্দিরে এইজন্য তিনি প্রচুর দান করেছিলেন। আমন-রা-এর মন্দিরের জন্য তিনি তিনটি বড় শহরসহ সমস্ত লেবানন অঞ্চল দান করেছিলেন। এর ফলে মিশরের পুরোহিতদের ক্ষমতা খুব বেড়ে যায়।

পুরোহিতদের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঃ তৃতীয় থুত্‌মোসের আমল থেকেই মিশরে পুরোহিতদের ক্ষমতা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে আমন-রা-এর মন্দিরের পুরোহিতদের ক্ষমতা প্রচণ্ড বাড়ে। তাঁরা রাজনীতিতেও খুব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এই প্রভাব এত বৃদ্ধি পায় যে, ফ্যারাওদের কাছ থেকেও অনেক ক্ষমতা তাঁরা ছিনিয়ে নেন। চতুর্থ আমেনহোটেপ নামে একজন ফ্যারাও এঁদের দমন করতে চেয়েছিলেন। এতে পুরোহিতগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। অবশ্য আমেনহোটেপ তাঁদের দমন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুরোহিতগণ আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ফ্যারাও দ্বিতীয় রামেসিসের সময় পুরোহিতদের সম্পত্তি দ্বিগুণ হয়। পুরোহিতগণ স্বাধীন হয়ে ওঠেন। উচ্চ পুরোহিতদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবৃদ্ধি ঃ দ্বিতীয় রামেসিস পুরোহিতদের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেও নিজে কিন্তু শক্তিহীন ছিলেন না। তাঁর সময় ফ্যারাওদের শেষ উল্লেখযোগ্য সামরিক অভিযান চালানো হয়। তিনি সিরিয়ার হিটাইটদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। অবশ্য এই যুদ্ধে দু'পক্ষের কেউ কাউকে তেমনভাবে হারাতে পারেন নি। হিটাইট এবং মিশরীয়রা সিরিয়া ভাগাভাগি করে নিয়েছিল।

এর পরই মিশরের নব রাজত্বের পতন শুরু হয়। মিশরের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। যেসব দেশের রাজগণ মিশরের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁরা স্বাধীন হতে থাকেন। মিশরবাসীদের নিজেদের মধ্যেও বিভেদ দেখা দিতে থাকে। ফলে অল্প-

দিনের মধ্যেই বিদেশীরা মিশর আক্রমণ করে। ফ্যারাওদের গৌরবের যুগ শেষ হয়।

(গ) ইরাণ

প্রায় তিন হাজার বছর আগে কাস্পিয়ান সাগরের তীর থেকে দক্ষিণে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে আর্য জাতির একটি শাখা বসতি স্থাপন করে। **'অরিয়ন্‌'** অর্থাৎ আর্যদের বসতি বলে দেশটির নাম হয়—ইরাণ দেশ। দেশটির সৌন্দর্য অপরূপ এবং এর ইতিহাসও খুব প্রাচীন।

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ন'শো বছর আগে ইরাণে দুটো বড় উপজাতি দেখা দেয়। তাদের একটি উপজাতির নাম **মীড**, অপরটির নাম **পারসিক**। প্রথম প্রথম মীডরাই খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠন করে এবং ব্যাবিলনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসিরিয়া নামক একটি শক্তিশালী দেশকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রতিবেশী পারসিকদের কাছে তারা হেরে যায়।

পারসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন **সাইরাস** নামে এক ব্যক্তি। গল্পে আছে, রাজার ছেলে হলেও তাঁকে নাকি মানুষ করে এক মেষ-পালক। তিনি বড় হয়ে পারসিকদের নেতা হন এবং তিন বছর একনাগাড়ে যুদ্ধ করে, মীডদের হারিয়ে দিয়ে, এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তিনি এক দক্ষ সেনাবাহিনী তৈরি করেন। তাদের সাহায্যে এশিয়া মাইনরের ছোট ছোট অনেক গ্রীক শহর এবং ব্যাবিলন দখল করেন। প্যালেস্টাইন এবং ফিনিসিয়াকেও তিনি যুদ্ধে হারিয়ে দেন। মিশর জয় করার ইচ্ছেও তাঁর ছিল, কিন্তু তার আগেই একটি যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান।

পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন সাইরাসের ছেলে **ক্যাম্বিসেস**। তিনি মিশর জয় করেন, কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর পরের রাজা প্রথম দরায়ুস পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে এই রাজ্যের বহু কাহিনী লিখে গিয়েছিলেন। এই কাহিনীগুলো থেকে সে যুগের সম্বন্ধে বহু কথা জানা যায়।

পারসিক রাজারা রাজ্য-শাসনের সুন্দর ব্যবস্থা করেছিলেন। সমগ্র দেশকে তাঁরা কতকগুলি ভাগে ভাগ করেছিলেন। এই ভাগগুলিকে বলা হতো **সত্রপী**। প্রতিটি সত্রপীতে একজন করে শাসক নিয়োগ করা হোতো। তাঁরা সত্রপীটি শাসন করে সম্রাটকে কর দিতেন। এই কারণে পারসিক রাজারা খুবই সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। প্রথম দরায়ুসের রাজত্বকালে ইরাণ সব দিক দিয়েই প্রচণ্ড উন্নতি করে। সারা দেশে তিনি একই রকমের মুদ্রা চালু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশময় অনেক রাস্তাঘাট তৈরি করা হয় এবং পথে যাতে চুরি-ডাকাতি না হয়, সেজন্য পাহারারও ব্যবস্থা করা হয়।

পারসিকরা যে বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল, তাতে পারসিকদের বহু সুযোগ-সুবিধে দেওয়া হোতো। তারা সেনাবাহিনীতে কাজ করত, চাষবাস করত, পশুপালন করত, কিন্তু কোন কর দিত না বা খুব পরিশ্রমের কাজও করত না। এসব কাজ করানো হোতো পরাজিত রাজ্যের লোকদের দিয়ে। তবে, গায়ের জোরে বেশিদিন রাজত্ব চালানো যায় না। পারসিকরাও রাজত্ব চালাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত গ্রীকরা ওদের হারিয়ে পারসিক সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয়।

ধর্ম : প্রাচীন ইরাণীয়রা বৈদিক আর্যদের মত অনেক দেবতার পূজো করত। এর মধ্যে **'মিথ্র'** (সূর্য), **'অনৈতা'** (পৃথিবী), **'হওম'** (বৃষ দেবতা) প্রধান। এইসব দেবতার পুরোহিতদের 'ম্যাজাই' বলা হোতো। ম্যাজাইরা 'হোম' বা 'সোম' নামে এক ধরনের লতার রস পান করে দেবতাদের পূজো করতেন। এই লতার রস শরীরকে উত্তেজিত করত। ভারতের বৈদিক সাহিত্যেও এই সোমরসের উল্লেখ আছে।

জরথুষ্ট্র ও তাঁর মতবাদ : প্রাচীন ইরাণী সভ্যতার সবচেয়ে বড় দান—তার ধর্ম ও রীতিনীতি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইরাণে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় ; তাঁর নাম জরথুষ্ট্র। তিনি ইরাণীদের মধ্যে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। জরথুষ্ট্রের মতবাদ হল : পৃথিবীতে দুই শক্তি আছে—ভালো ও মন্দ। ভালো অর্থাৎ পুণ্যের

দেবতা হলেন 'আহুর-মাজদা' এবং 'আহির্মান' হলেন পাপের দেবতা। একজন আলোর রাজ্যের অধিপতি, অন্যজন অন্ধকার রাজ্যের রাজা। আহুর-মাজদার সঙ্গে আহির্মানের নিয়ত যুদ্ধ চলেছে। আহুর-মাজদাই হলেন মূল সৃষ্টিকর্তা। আহুর-মাজদাকে ঘিরে আছেন কয়েকজন সৎ দেবতা। তার মধ্যে মিথ্র বা আলোর দেবতা প্রধান। এই আলোর জন্ম আগুন থেকে। তাই আলোর পূজারী ইরাণীদের বলা হয় অগ্নি-উপাসক। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইরাণীরা আগুনের পূজো করেন না। আগুনকে তাঁরা পবিত্র বলে মনে করতেন এবং কখনও আগুন নেভাতেন না। ইরাণীদের কাছে আলো ছিল সত্য এবং জ্ঞানের প্রতীক। আলো যেমন অন্ধকার দূর করে, ভালোর কাছে মন্দও তেমনি হেরে যায়।

জরথুষ্ট্রের মতবাদ পরবর্তীকালে যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে বলে **'আবেস্তু'**। আবেস্ত শব্দের অর্থ হল—জ্ঞান। 'জেন্দ' ভাষায় গ্রন্থটি লেখা হয়েছিল বলে গ্রন্থটিকে **'জেন্দ আবেস্তু'** বলা হয়। আবেস্ত গ্রন্থে প্রত্যেক মানুষের তিনটি কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে: শত্রুকে মিত্র করা, দুষ্টকে শিষ্ট করা এবং অজ্ঞকে বিজ্ঞ করা। আহুর-মাজদার কোনও মন্দির বা মূর্তি নেই। কোনও উঁচু খোলা জায়গায় বেদী রচনা করে তাঁর উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালা হয় এবং নানা প্রকার খাদ্য, পানীয় ও সুগন্ধিদ্রব্য আহুতি দিয়ে তাঁর পূজো করা হয়। পূজোয় হোমরস পান ও বিতরণের ব্যবস্থাও থাকত।

ইরাণীরা মৃতদেহ কবর দেন না বা পুড়িয়ে ফেলেন না; কোনও উন্মুক্ত স্থানে মৃতদেহ ফেলে রাখেন। তাঁদের ধারণা, পোড়ালে বা কবর দিলে জীবিতকালে দেহের মধ্যে যে সমস্ত গুণের সমাবেশ হয়েছিল, তা নষ্ট হয়ে যাবে। যেস্থানে ইরাণীরা মৃতদেহ ফেলে রাখেন, তাকে বলে 'দোখ্মা'। ইংরাজিতে বলা হয় **'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'**। চিল, শকুন প্রভৃতি পাখিরা মৃতদেহগুলি খেয়ে ফেলে।

ইরাণে এখন অবশ্য এ ধর্ম নেই। এখন সেখানকার সব লোকই মুসলমান। বারোশ বছর আগে আরবরা জরথুষ্ট্রের ধর্মাবলম্বীদের ইরাণ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ইরাণীদের মধ্যে অনেকেই তখন ইরাণ থেকে চলে এসে ভারতবর্ষে বসবাস করতে শুরু করেন। এদের বংশধরেরা

এখনও বোম্বাই অঞ্চলে বসবাস করেন। তারা জরথুষ্ট্রেয় ধর্ম ও অনুশাসন মেনে চলেন।

(ঘ) ইহুদী জাতি

ইহুদী বা হিব্রুরা পশ্চিম এশিয়ার একটি প্রাচীন জাতি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এই হিব্রু জাতি ইউফ্রেতিস নদীর ধারে বাস করত। তারা ছিল যাযাবর এবং তাদের প্রধান পেশা ছিল মেষপালন। খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ **'বাইবেল'**-এর ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশে ইহুদীদের গল্প আছে।

ইহুদীদের প্রাচীন পুরুষের নাম **আব্রাহাম**। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ছয় হাজার আগে যাযাবর ইহুদীদের তিনিই নিয়ে আসেন মিশরে। এর আগে ইহুদীরা ছিল মেসোপটেমিয়ায়। ইহুদীরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। সেই ঈশ্বরের নাম **যিহোবা**। ইহুদীদের বিশ্বাস তিনি তাদের বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। তাঁরই নির্দেশে ইহুদীরা মিশরে এসে বসবাস করতে থাকে।

ইহুদীরা মিশরে আসার পর হিকসসরা মিশর দখল করে। ইহুদীরা ওদের সঙ্গে মোটামুটি সদ্ভাবেই বসবাস করতে থাকে। ধনজন ও সম্পদে তারা খুব উন্নতি করে। তাই মিশরীয়রা ক্রমশঃ ওদের হিংসে করতে শুরু করে। তারপর মিশরীয়রা যখন হিকসসদের মিশর থেকে তাড়িয়ে দিল, তখন থেকে শুরু হল ইহুদীদের দুঃখের দিন। ফ্যারাও ইহুদীদের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে ওদের দাসে পরিণত করেন।

এরপর শুরু হয় ইহুদী নির্যাতন ; জোর-জুলুম করে তাদের দিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করানো হোতো। তারা ইটখোলায় কাজ করত, রাজপথ তৈরি করত, বড় বড় বাড়ি তৈরি করত। কাজে সামান্য ত্রুটি হলেই তাদের পিঠে চাবুক মারা হোতো। তারা যাতে মিশর থেকে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য পথে পথে মিশরীয় সৈন্যরা পাহারা দিত। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে ইহুদীদের যিনি উদ্ধার করেন, তাঁর নাম মোজেস।

মোজেস ঃ মিশরে ইহুদীদের সংখ্যা যাতে বেড়ে না যায়, তার

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফ্যারও-এর হুকুমে ইহুদীদের পুত্রসন্তান জন্মালে, তাদের মেরে ফেলা হতে লাগল। ফ্যারাও-এর মেয়ে একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে নদীর জলে ঝুড়ির মধ্যে ভেসে-থাকা একটি ইহুদী শিশুকে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসে পালন করতে লাগলেন। পরবর্তীকালে এই শিশুই হলেন ইহুদীদের প্রথম ধর্মগুরু 'মোজেস'। সে সময়ে ইহুদীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। ইহুদী ক্রীতদাসদের দিয়ে মিশরীয়রা রাস্তা ও পিরামিড তৈরির কাজ করিয়ে নিত। মিশরীয় সৈন্যেরা সব সময় তাদের চাবুক মারত। তাঁদের পালিয়ে যাবারও উপায় ছিল না।



মোজেস

মোজেস এই ইহুদীদের দলবদ্ধ করলেন এবং তাদের মিশর থেকে বের করে আনলেন। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশে মোজেস মিশরীয়দের হাত থেকে ইহুদীদের কেমন ভাবে রক্ষা করেছিলেন, তার গল্প আছে। ফ্যারাও যখন দেখলেন যে, ইহুদীরা পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি তাদের ধরে আনবার জন্য তাঁর সৈন্যবাহিনী পাঠালেন। ইহুদীরা লোহিত সাগরের তীরে এসে দেখল যে, মিশরীয়রা তাদের তাড়া করে আসছে। তারা অত্যন্ত ভয় পেয়ে মোজেসকে দোষারোপ করতে লাগল। মোজেস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন। ঈশ্বরের আদেশে সাগরের জল তুপাশে সরে গেল এবং এই মাঝ পথেই ইহুদীরা সাগর পার হয়ে গেল। পরে মিশরীয় সৈন্যবাহিনী যখন ঐ পথ ধরে সাগর পার হতে চেষ্টা করল, সেই সময় ঈশ্বর আরব সাগরের জল যেমন ছিল তেমনি করে দিলেন। ফলে ফ্যারাও-এর সব সৈন্যসামন্ত সাগরের জলে ডুবে মারা গেল।

মোজেসের নেতৃত্বে ইহুদীরা এরপর বহু বছর প্রান্তরে প্রান্তরে

ঘুরে বেড়াল। তারপর তারা সিনাই নামে এক পাহাড়ের কাছে উপস্থিত হল। এখানে মোজেসের মাধ্যমে ঈশ্বর ইহুদীদের তাঁর দশটি আদেশ দান করেন। এই দশটি আদেশই ইহুদীদের প্রথম আইন। এই দশটি আদেশ হল ঃ (১) যিহোবাই একমাত্র ঈশ্বর, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে পূজো করবে না; (২) কোনও মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ করবে না; (৩) বৃথা ঈশ্বরের নাম নেবে না; (৪) বিশ্রাম দিনে কোনও কাজ করবে না; (৫) পিতামাতাকে সম্মান করবে; (৬) নরহত্যা করবে না; (৭) নারীজাতিকে শ্রদ্ধা করবে; (৮) চুরি করবে না; (৯) প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না; (১০) প্রতিবেশীর দ্রব্যের প্রতি লোভ করবে না।

এই দশটি আদেশ দুটি পাথরের ফলকে লিখে ঈশ্বর মোজেসকে দিলেন। পরে এই পবিত্র পাথরের ফলক দুটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে ইহুদীদের মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

দাসত্ব থেকে মুক্তি ঃ মোজেস সম্পর্কে এই গল্প কতদূর সত্য তা জানা যায় না। তবে এই কথা বলা যায়, মিশরীয়দের দাসত্ব থেকে তিনিই ইহুদীদের মুক্ত করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ঠিক, তিনি কোনও জায়গায় ইহুদীদের স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন নি। ইহুদীদের সঙ্গে করে তিনি চল্লিশ বছর ধরে নানা জায়গায় ঘুরেছেন, কিন্তু মনের মত জায়গা খুঁজে পান নি। ইহুদীরা অনেক অসুবিধে অতিক্রম করে অবশেষে বহুদিন পরে প্যালেস্টাইনে নিজেদের বাসভূমি তৈরি করে।

অনুশীলনী

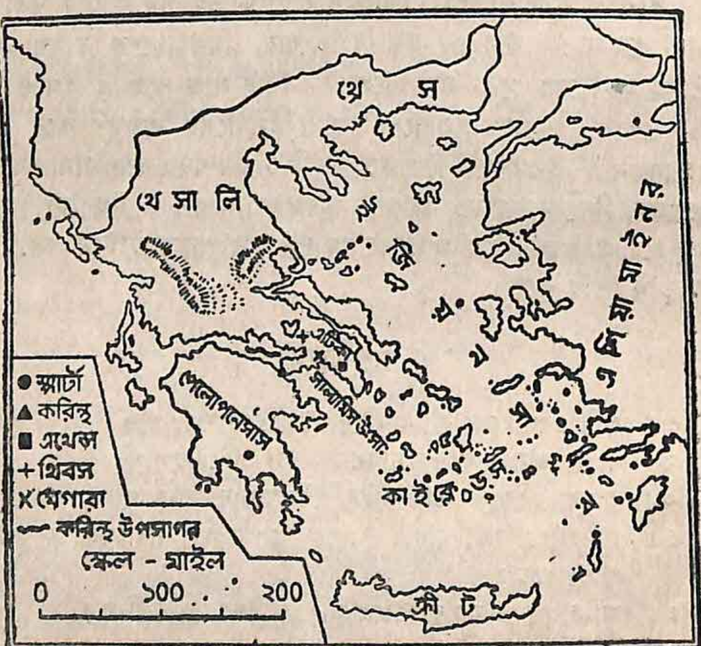
১। কৃষি ও বাণিজ্যে ব্যাবিলনীদের উন্নতির পরিচয় দাও।
২। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ব্যাবিলন কতটা এগিয়েছিল ?
৩। হামুরাবি কে ? তাঁর আইনবিধি সম্বন্ধে যা জান বল।
৪। হামুরাবির আইনবিধি থেকে সেকালের সমাজের কি পরিচয় পাওয়া যায় ?
৫। আদি, মধ্য ও নব রাজাদের আমলে মিশর কেমন ছিল ?
৬। মিশরীয় পুরোহিতদের ক্ষমতাবৃদ্ধির পরিচয় দাও।
৭। পারসিক সাম্রাজ্য কে প্রতিষ্ঠা করেন ? তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৮। শাসন চালাবার জন্য পারসিকরা কেমন ব্যবস্থা করেছিলেন ?
৯। জরথুষ্ট্র কে ? তাঁর মতবাদ কি রকম ছিল ?

১০। ইহুদীদের ঈশ্বরের নাম কি ? মিশরে কিভাবে ইহুদীদের নির্যাতন করা হোতো ?
১১। মোজেস কে ? কিভাবে তিনি দাসত্ব থেকে ইহুদীদের মুক্তি দিলেন ?
১২। মোজেসের মাধ্যমে ঈশ্বর ইহুদীদের কি কি আদেশ দেন ?
১৩। **দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**
(ক) সারগণ কে ছিলেন ?
(খ) ব্যবিলনীয় মহাকাব্যের নাম কি ?
(গ) ইরাণ নামের উৎপত্তি কোথা থেকে ?
(ঘ) 'আবেস্ত' কি ?
(ঙ) 'দোখমা' বলতে কি বোঝায় ?

পঞ্চম অধ্যায় ঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রীস

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণে গ্রীস একটি ছোট দেশ। মানচিত্রে দেখ, দেশটার চেহারা কেমন ভাঙ্গাচোরা, পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।



গ্রীসের মানচিত্র

দেশটির তিন দিক ঘিরে আছে ভূমধ্যসাগর। করিন্থ উপসাগর দেশটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে।

আর্যদের কয়েকটি দল এশিয়া মহাদেশ থেকে ইউরোপে চলে এসেছিল। এদের মধ্যে যারা ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের এই দেশে প্রবেশ করে, তারা ছিল **'হেলেন'** বংশীয়। হেলেনীয়দের নাম অনুসারে দেশটির নাম হল হেলাস দেশ। পরবর্তীকালে রোমীয়রা এই দেশের নাম দেয় গ্রীস দেশ। দেশটির মধ্যে বহু পাহাড়-পর্বত থাকায় দেশটি অনেকগুলি ছোট-ছোট অংশে ভাগ হয়ে পড়ে। ফলে হেলেনবংশীয়রা এখানে অনেকগুলি ছোট-ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

ক্রীটের প্রাচীন সভ্যতা ঃ গ্রীকরা এই দেশে সভ্যতা গড়ে তোলার আগেই গ্রীসের দক্ষিণে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের লোকেরা এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। মিশর এবং ব্যবিলনের মত সেই সভ্যতাও যেমন প্রাচীন, তেমনি উন্নত। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে ক্রীট দ্বীপের লোকেরা বড় বড় রাজপ্রাসাদ, রঙ-বেরঙের মাটির পাত্র তৈরি ইত্যাদি করতে শিখেছিল। লিখতেও শিখেছিল এরা। তবে, প্রথমে সেই লিপি ছিল চিত্রলিপি, পরে হয় রেখালিপি। এরা দুর্গ তৈরি করতে জানত। এরা রোদে শুকিয়ে ইট তৈরি করত এবং ধাতুর ব্যবহারও জানত। এরা সোনার গহনা ব্যবহার করত। এরা মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার অধিবাসীদের মত নগর পরিকল্পনা করে শহরও গড়তে জানত, তিন-চারতলা বাড়ি তৈরি করত, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও জানত। পরবর্তীকালে ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে গ্রীকরা যে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, তার পেছনে ক্রীট সভ্যতার প্রভাব ছিল যথেষ্ট।

হোমারের মহাকাব্য ঃ গ্রীকরা ছিল আর্য জাতিরই এক-একটি শাখা। আর্যদের জীবিকা ছিল পশুপালন। যেখানে বেশী ঘাস পেত, সেখানেই চলে যেত এরা। তাই সেখানকার লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যেত এদের। যুদ্ধ করে আর্যরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিরা এই যুদ্ধ নিয়ে গান রচনা করতেন। বড় বড় যোদ্ধারের কাহিনী সুন্দর করে লেখা হোতো সে-সব গানে। গ্রীসও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও যুদ্ধের কাহিনা নিয়ে **'ইলিয়াড'** এবং **'ওডিসি'** নামে দুটি মহাকাব্য লেখা হয়। 'ইলিয়াড'-এর বিষয়বস্তু হল—ট্রয় নগরীর সঙ্গে

গ্রীকদের যুদ্ধের কাহিনী, আর 'ওডিসি'তে স্থান পেয়েছে ট্রয়ের পতনের পর গ্রীক বীর ওডিসিয়াসের নানা দেশভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী। এই মহাকাব্য দুটির রচয়িতা হিসেবে গ্রীক কবি হোমারের নাম উল্লিখিত আছে। যদিও, পণ্ডিতদের ধারণা, এই কাব্য দুটিতে বহু কবির রচনা ঢুকে গেছে।

'ইলিয়াড' মহাকাব্য যখন লেখা হয়, তখন গ্রীসে ছিল ছোট-ছোট জনপদ। এগুলোতে যে-সব রাজা রাজত্ব করতেন, তাঁদের ধারণা ছিল, তাঁরা সকলে একই পূর্বপুরুষ থেকে এসেছেন। তাই ভিন্ন জনপদে বাস করলেও তাঁরা নিজেদের **'হেলেনিস'** নামে পরিচয় দিতেন। এই রকম এক জনপদের নাম ছিল আরগন। সেখানকার রাজা ছিলেন অ্যাগামেনন। তাঁর ভাই মেনিলাস রাজত্ব করতেন স্পার্টায়; তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল **হেলেন**। গ্রীস দেশের উত্তর-পূর্ব দিকে, সাগরের অপর পারে এশিয়া-মাইনরে ট্রয় নামে এক নগরী ছিল। সেখানকার রাজপুত্র স্পার্টায় বেড়াতে এসে হেলেনকে চুরি করে নিয়ে যান। এতে গ্রীসের রাজগণ প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করেন এবং সবাই মিলে সাগর পাড়ি দিয়ে ট্রয় আক্রমণ করেন। অনেকদিন ধরে যুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত ট্রয় নগরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং গ্রীক বীরেরা হেলেনকে স্পার্টায় ফিরিয়ে আনেন।

ইথাকা নামে এক রাজ্যের রাজা ছিলেন ওডিসিয়াস। ট্রয় থেকে আসার পথে তাঁর জাহাজ ডুবে যায়। ঈজিয়ান সাগর ছিল অসংখ্য দ্বীপে ভর্তি। ওডিসিয়াস নানা দ্বীপ ঘুরে অবশেষে দেশে ফেরেন। এভাবে ঘোরার সময়ে তিনি বিভিন্ন দ্বীপে নানা বিচিত্র মানুষ, রাক্ষস ও ডাইনির দেখা পান। অনেকবার বিপদেও পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে সব বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে দেখেন, বিভিন্ন জনপদের রাজগণ তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে খুবই বিরক্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন। তিনি তাঁদের সকলকে হারিয়ে আবার ইথাকায় রাজত্ব করতে থাকেন। ওডিসিয়াসের এই কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে **'ওডিসি'** মহাকাব্য।

এই দুই মহাকাব্যের কাহিনী কতদূর সত্য, তা জানা যায় না; তবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন।

হোমারীয় যুগে গ্রীসের জীবনযাত্রা ঃ 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি' থেকে সেকালের গ্রীসের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। সেকালে গ্রীসের লোকেরা চাষবাস এবং পশুপালন করত। গ্রীসে তখন ছিল ছোট-ছোট জনপদ। প্রতিটি জনপদে এক-একজন রাজা থাকলেও সাধারণ মানুষ আর রাজাদের জীবনযাত্রা ছিল প্রায় একই রকমের। রাজারাও সাধারণ মানুষের মত ঘরের কাজ এবং ক্ষেতের কাজ করতেন। তবে, যুদ্ধের সময় তিনিই হতেন প্রধান সেনাপতি। পূজা-পার্বণের দিনে তিনিই হতেন প্রধান পুরোহিত। তিনি বিচারকের কাজও করতেন। তবে, সেকালে রাজত্ব বংশানুক্রমিক ছিল না। রাজার ছেলেই যে রাজত্ব পাবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। যাঁর শক্তি বেশি ছিল, তিনিই রাজা হতেন। সে-সময় গ্রীকরা অন্য দেশ লুঠ করতে বেরোত। তখন তারা ধনসম্পদ তো লুঠ করতই, সেই সঙ্গে বিদেশ থেকে মানুষদেরও ধরে আনত। এই বন্দী মানুষদের তারা হয় দাস হিসেবে ঘরের কাজে লাগাত, নয়তো বাজারে বিক্রি করে দিত।

প্রাচীন গ্রীকসমাজে বাড়ির কর্তাই ছিলেন পরিবারের সর্বেসর্বা। পরিবারের সকলে তাঁর কথা মেনে চলত। বাড়ির মেয়েরাও সে-সময় বসে থাকত না। সময় পেলে তারা সুতো কাটত, তাঁত বুনত বা সেলাই-ফোঁড়াই করত। গ্রীকদের প্রধান খাদ্য ছিল মাংস, আর পানীয় ছিল সুরা।

নগর-রাষ্ট্র ঃ এ সময়ে গ্রীকদের যিনি রাজা হতেন, তিনি নিজের খুশিমত চলতে পারতেন না। শহরের প্রধান প্রধান লোকেরা একত্রে মিলে নানা বিষয়ে আলোচনা করে রাজাকে উপদেশ দিতেন। রাজা সেই উপদেশ মত চলতেন। এইসব প্রধান প্রধান লোকদের ক্ষমতা ও প্রভাব পরে এত বেড়ে গিয়েছিল যে, অনেক জনপদে রাজার আর প্রয়োজনই ছিল না। সেখানে এই প্রধানেরাই মিলেমিশে দেশ শাসন করতেন। সে-সময়ে গ্রীসের নানা স্থানে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যগুলো একটি শহর ও আশেপাশের ছোট ছোট অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠত। রাজ্যগুলোর অধিকাংশই ছিল নগর-রাষ্ট্র।

'ইলিয়াড' মহাকাব্যে এই নগর-রাষ্ট্রের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনিতেই এগুলো ছিল আলাদা আলাদা রাজ্য। এদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ লেগে থাকত। কিন্তু সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এরা সবাই মিলেমিশে যুদ্ধ করত। অধিকাংশ নগর-রাষ্ট্রই ছিল খুব ছোট। লোকসংখ্যাও পঁচিশ হাজারের বেশি ছিল না।

সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ও উপনিবেশ স্থাপন ঃ এইসব নগর-রাষ্ট্রগুলির বিশেষত্ব ছিল, এরা ঈজিয়ন সাগরের নানা দ্বীপে তো বটেই, বিদেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে উপনিবেশ গড়ত। এভাবে এরা সিসিলি, ইতালী, ভূমধ্যসাগরের নানা অঞ্চল, এশিয়া মাইনর প্রভৃতি জায়গায় উপনিবেশ গড়েছিল। নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকলেও গ্রীকদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হোতো। নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স ছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সবচেয়ে উন্নত। গ্রীসের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এথেন্সে লোক আসত এবং এই কারণে এথেন্সের লোকসংখ্যা ছিল অন্য রাষ্ট্রের তুলনায় বেশি। মিশর, ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও গ্রীকদের সাংস্কৃতিক ভাব-বিনিময় ঘটেছিল। এর ফলে গ্রীকরা নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে পেরেছিল।

এথেন্স ও স্পার্টা ঃ সে-সময়ে গ্রীসে চারটি রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। এরা হল ঃ **এথেন্স, স্পার্টা, করিন্থ ও থিব্‌স্‌**। করিন্থ এবং থিব্‌সে ছিল অভিজাত লোকদের শাসন। এথেন্স ছিল সাধারণতন্ত্র। কিন্তু এই সাধারণতন্ত্রে স্বাধীন নাগরিক ছাড়া আর কারোর কোন অধিকার ছিল না। স্পার্টায় রাজতন্ত্র থাকলেও রাজারা খুব শক্তিশালী হতে পারতেন না। কারণ ওখানে দুজন রাজা একসঙ্গে রাজত্ব করতেন।

এথেন্সের সাধারণতন্ত্র ও রাজনৈতিক জীবন ঃ যে শাসনে জনসাধারণের সকলেই অংশ নেবার অধিকারী, তার নাম **'সাধাণরতন্ত্র'**। আজ আমরা লোকসভা বা বিধানসভায় প্রতিনিধি পাঠাই, আমাদের হয়ে তাঁরাই দেশ শাসনে অংশ নেন। এথেন্সের সাধারণতন্ত্র ছিল একটু অন্য রকম। তখন লোকসংখ্যা কম ছিল, তাই প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজন হোতো না। এথেন্সের স্বাধীন নাগরিকগণ সবাই এক জায়গায় সমবেত হয়ে রাজ্য শাসনের বিষয়ে তাঁদের মতামত জানাতেন।

এভাবে দেশশাসনের ব্যাপারে প্রতিটি স্বাধীন নাগরিকের ব্যক্তিগত মতামতের একটা মূল্য থাকত।

কিন্তু এথেন্সে বাস করলেই সকলে স্বাধীন নাগরিক হোতো না। যাদের পিতামাতা এথেন্সের স্বাধীন নাগরিক ছিলেন, তাদের ছেলেরাই কেবল স্বাধীন নাগরিক বলে গণ্য হোতো। তারা যাতে যথোপযুক্ত নাগরিক হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখা হোতো এবং তাদের গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া হোতো।

তবে, সাধারণতন্ত্র থাকলেও এথেন্সে এক সময় অভিজাত লোকরাই দেশ শাসন করতেন। রাজ্য চালাতেন সে-সময় তিন ধরণের কর্মচারী। এঁদের বলা হোতো : **আর্কন, রাজা** এবং **পোলেমার্ক**। আর্কন ছিলেন দেওয়ানী মামলার প্রধান। রাজা পরিচালনা করতেন ধর্মব্যবস্থা। ধর্মসংক্রান্ত বিচারসভারও প্রধান ছিলেন তিনিই। আর পোলেমার্ক ছিলেন প্রধান সেনাপতি। বিচারবিভাগীয় কিছু কিছু দায়িত্বও তাঁর হাতে ছিল। এছাড়া বয়স্ক ব্যক্তিদেরও একটি সভা ছিল।

এথেন্সের সামাজিক জীবন : সে সময় এথেন্সের জনসাধারণ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এরা হল : **অভিজাত, কৃষক** এবং **জনকর্মী**। অভিজাত অর্থে—ধনসম্পদে যাঁরা পরিপূর্ণ ছিলেন। তাঁদের ছিল বহু জমি, ধনসম্পদ, ঘোড়া, ষাঁড়, পাল্‌কী প্রভৃতি। কৃষকরা নিজেদের জমি চাষ করত, আর জনকর্মীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এই তিন শ্রেণীর মানুষই জাতীয় সভায় অংশ নিতে পারত। এরা ছাড়া কৃষি-শ্রমিক নামে আর এক শ্রেণীর মানুষ ছিল। এরা চাষবাস করত বটে, কিন্তু এদের নিজেদের কোন জমি ছিল না। অভিজাতদের জমিই চাষ করত এরা। কোন এক সময় ধনসম্পদের পরিমাণ দেখেও এথেন্সের অধিবাসীদের তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হোতো। একেবারে অভিজাতরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সম্পদশালী। যাঁরা অন্ততঃ একটা ঘোড়া পুষতে পারতেন এবং যুদ্ধের সময় সেই ঘোড়ার সাহায্যে অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে কাজ করতে পারতেন, তাঁরা গণ্য হতেন দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্পদশালী হিসেবে। আর সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে যাঁরা অন্ততঃ একজোড়া ষাঁড় পুষতে পারতেন এবং তা দিয়ে চাষের কাজ চালাতে পারতেন, তাঁরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর সম্পদশালী। পরে অবশ্য চতুর্থ শ্রেণী বলে আর একটি শ্রেণী এতে যুক্ত হয়েছিল।

এথেন্সের এই সমাজব্যবস্থার ওপর তলার মানুষদের কোন অসুবিধেই ছিল না। তাঁরা যথারীতি আরামে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতেন। কিন্তু সমাজের নীচুতলার লোকেরা এইসব ব্যবস্থায় খুব সুখী ছিল না। এক সময় তাই তাদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। সোলোন নামে এক আইনস্রষ্টা তখন নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে সেই অসন্তোষকে দূর করার চেষ্টা করেন। এথেন্সের শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করে তিনি শ্রমজীবীদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন এবং সমস্ত শ্রেণীর মানুষদের নিয়ে এক বিচার-বিভাগ খোলেন। সমাজের অভিজাত মানুষেরাও এই বিচারালয়ে হাজির হতে বাধ্য থাকতেন। সমাজের তিন শ্রেণীর লোকদের নিয়ে সোলোন একটি জাতীয় সভাও গঠন করেছিলেন। তবে এতে কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

এথেন্সবাসীর নাগরিক জীবনঃ এথেন্সে শিশুদের লেখাপড়া শিখবার জন্য অনেকগুলি বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষকরা নিজেরাই এই বিদ্যালয়গুলি চালাতেন। ছাত্রদের কাছ থেকে মাইনে নিয়ে তাঁরা বিদ্যাদান করতেন। সাধারণতঃ ছেলেরা বিদ্যালয়ে পড়ত ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। এখানে তাদের ইতিহাস পড়ানো হোতো; গান গাইতে আর ছবি আঁকতেও শেখান হোতো। শরীরচর্চা আর নাচ শেখাবারও ব্যবস্থা ছিল। মেয়েদের শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল—ঘরের কাজ। অবশ্য তারাও লিখতে পড়তে শিখত, সুতো কাটত, তাঁত বুনত, সূচের কাজ করতে শিখত, আর শিখত গানবাজনা।

ষোল বছর বয়স হলে ছেলেদের বেশি করে শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া হোতো। আঠারো বছর বয়সে তাদের শেখান হোতো যুদ্ধবিদ্যা আর নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষা শেষ হলে তাদের নগররক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হোতো। তেইশ বছর বয়স হলে একজন এথেন্সবাসীকে পূর্ণ নাগরিক বলে ধরা হোতো।

এথেন্সবাসীরা লেখাপড়া, বাণিজ্য, দেশ-শাসন—সব কাজই মন দিয়ে করত। তাদের শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শ ছিল জীবনকে নানা দিক থেকে সুন্দর করা। এথেন্সের পুরুষরা বেশির ভাগ সময় কাটাত পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করে ও আলোচনা করে।

অপরাহ্নে তারা নগর ভ্রমণ করত। এথেন্সবাসীদের কাছে থিয়েটার ছিল খুব প্রিয়। কোন উৎসব হলেই তারা খোলা জায়গায় বসে নাটকের অভিনয় দেখত। এভাবে আমোদ-প্রমোদ ও কাজের মধ্য দিয়ে এথেন্স-বাসীরা নিজেদের পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করত।

স্পার্টার নাগরিক জীবন ঃ এথেন্সবাসীদের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল শান্তি ; কিন্তু স্পার্টার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ। স্পার্টার চারদিকে ছিল পাহাড় আর বিপক্ষ প্রতিবেশী। তাই স্পার্টাকে বরাবর যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়েছে।

প্রবাদ আছে যে, **'লাইকারগাস'** নামে এক ব্যক্তি স্পার্টার লোকদের জন্য কঠোর নিয়মকানুন প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রণীত নিয়মগুলি স্পার্টানদের মেনে চলতে হোতো। যারা স্বাধীন নাগরিক, তাদের সাংসারিক চিন্তার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ক্রীতদাসরা তাদের হয়ে খাটত। তাই স্পার্টানরা শরীরচর্চা ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষায় তাদের সমস্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করত। স্পার্টায় রুগ্ন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে পাহাড়ের ধারে ফেলে দেওয়া হোতো ; কারণ রাষ্ট্রের প্রয়োজন —সুস্থ বলিষ্ঠ মানুষ। সাত বছর বয়স পর্যন্ত স্পার্টার শিশুরা পিতা-মাতার কাছে থাকত ; তারপর রাষ্ট্রই শিশুদের শিক্ষার ভার নিত।

স্পার্টায় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক স্পার্টানকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলা। সেইজন্য ছাত্রেরা নানাভাবে শরীরচর্চা করত। ছাত্রদের কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হোতো। তাদের খেতেও দেওয়া হোতো সামান্য। বেশি খাবারের প্রয়োজন হলে তারা চুরি করে খাবার জোগাড় করতে পারত, কিন্তু ধরা পড়লে তাদের ভীষণ শাস্তি দেওয়া হোতো। ছেলেরা যাতে দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে, সেজন্য মাঝে মাঝে তাদের বেত মারা হোতো। কুড়ি বছর বয়সে স্পার্টান যুবকরা বিয়ে করতে পারত। বিয়ে করে তারা অবশ্য খুব বেশী দিন বাড়িতে থাকতে পেত না। তাদের কাটাতে হোতো সেনানিবাসে। সেনানিবাসে থাকার সময়ও তাদের জীবনে কোনরূপ বিলাসিতা বা আরামের ব্যবস্থা ছিল না।

স্পার্টান মেয়েরাও ছেলেদের মত ব্যায়াম করত। মেয়েদের

ব্যায়ামের জন্য আলাদা জায়গা ছিল। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে মেয়েদের শরীরও বেশ সবল ও সুগঠিত হয়ে উঠত। মেয়েদের শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভবিষ্যতে তারা বলিষ্ঠ ও নির্ভীক সন্তানের মা হতে পারে।

এথেন্স বনাম স্পার্টা ঃ আগেই বলেছি, গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টাই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। এক সময় এই দুই রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলে পারস্যের রাজার গ্রীস আক্রমণ ব্যর্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু এরপর এদের নিজেদের মধ্যেই বিবাদ শুরু হয়ে যায়। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এথেন্স এবং স্পার্টার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দু'রকম। এদের নিয়ে গ্রীসের রাজ্যগুলোও দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। যে-সব রাজ্য সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাস করত, তারা সমর্থন করত এথেন্সকে; আর যারা অভিজাততন্ত্র পছন্দ করত, তারা সমর্থন করত স্পার্টাকে। দুই রাষ্ট্রের বিরোধ ক্রমশঃ দীর্ঘতর হলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। মাঝে কিছুদিন বাদ দিয়ে প্রায় ২৭ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলে। গ্রীসের প্রায় সব রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে দু'পক্ষের এক পক্ষে যোগ দেয়। গ্রীসের ইতিহাসে এই যুদ্ধ **'পেলোপোনেসিয় যুদ্ধ'** নামে খ্যাত।



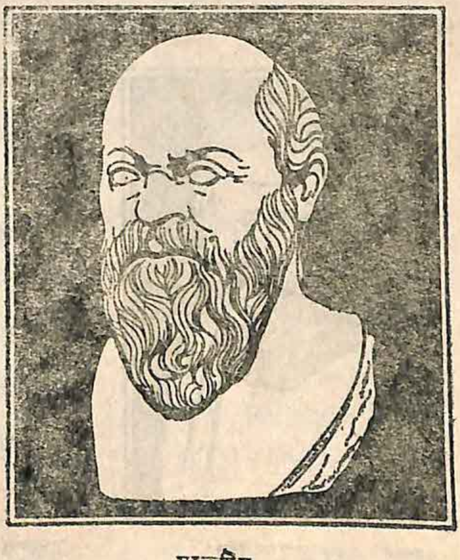
পেরিক্লিস

এই যুদ্ধে এথেন্সের পতন হয়, স্পার্টারও শক্তিক্ষয় হয়। ফলে গ্রীস দুর্বল

হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ম্যাডিসন নামক একটি রাজ্য সমস্ত গ্রীসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আগে গ্রীসের লোকেরা ম্যাসিডনের লোকদের বর্বর বলত। এখন তারাই হল গ্রীসের নায়ক।

সংস্কৃতিক্ষেত্রে এথেন্সের শ্রেষ্ঠত্বঃ যুদ্ধের ব্যাপারে স্পার্টাই ছিল শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার উন্নতিতে এথেন্সের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। এথেন্সের বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক পেরিক্লিস একটি শক্তিশালী রাজ্য গড়ে তোলেন। এই সময় দেশের শাসনভার ছিল জনসাধারণের উপর। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তখন এথেন্স প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছিল। পেরিক্লিস এথেন্সকে সমগ্র গ্রীসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগরে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় এথেন্স সব দিকে দিয়ে চরম উন্নতি লাভ করে। এই যুগে এথেন্সে জন্মেছিলেন অনেক চিন্তাশীল ও গুণী ব্যক্তি। তাই এই যুগের সাহিত্য ও শিল্প আজও সারা জগতের আদরের জিনিস হয়ে রয়েছে। এই সব চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের নাম চিরদিন পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

সক্রেটিসঃ সক্রেটিস জন্মেছিলেন যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় ৪৭০ বছর আগে। তিনি ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রির ছেলে। তাঁকে দেখতে সুন্দর ছিল না; কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির জন্য সারা দেশ তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সত্যকে জানা। অল্পদিনের মধ্যে সক্রেটিস এথেন্সের যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি পথে পথে ঘুরে মুখে লোকদের শিক্ষা দিতেন। প্রশ্ন



সক্রেটিস

ও উত্তরের সাহায্যে তিনি লোকশিক্ষার প্রচার করেন। সক্রেটিসের এই জনপ্রিয়তায় এথেন্সের কিছু লোক তাঁর উপর চটে যায়। শেষে অবস্থা এমন হয় যে, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করা হল, তিনি দেশের ধর্ম মানেন না ও দেশের সমাজব্যবস্থাকে নষ্ট করতে চান। বিচারে তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। জেলখানায় '**হেমলক**' নামক বিষ পান করে তিনি মৃত্যু-বরণ করেন। 'নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার দিয়ে সব কিছু যাচাই করে নাও'—এই ছিল সক্রেটিসের উপদেশ।

প্লেটো ঃ সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন প্লেটো। তাঁর লেখা '**ডায়ালোগ্‌স**' নামক বইতে তিনি সক্রেটিসের শিক্ষা এবং মতবাদ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তাঁর আর একখানি বিখ্যাত বই হল '**রিপাবলিক**'। তাতে রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত, সেই সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। '**ফিডো**' নামক বইটিতে তিনি তাঁর গুরু সক্রেটিসের মৃত্যুর চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন।

অ্যারিস্টটল ঃ প্লেটোর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন অ্যারিস্টটল। ইনি এক সময় সম্রাট আলেকজান্দারের শিক্ষক ছিলেন। অ্যারিস্টটল খুব বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জানতেন না এমন বিষয় ছিল না। লাইসিয়াম নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি গড়েছিলেন।

হেরোডোটাস ও থুসিডিডিস ঃ পেরিক্লিসের যুগে ইতিহাস রচনারও বিশেষ উন্নতি হয়। এই যুগে যাঁরা ইতিহাস লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হেরোডোটাস ও থুসি-ডিডিস। **হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জন্মদাতা বলা হয়।** তিনি পারস্য ও গ্রীসের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, তার ইতিহাস রচনা করে গেছেন।



হেরোডোটাস

থুসিডিডিসের সময়ে এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধকে পেলোপোনেসিয় যুদ্ধ বলা হয়। থুসিডিডিস এই যুদ্ধের ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন। এই

ইতিহাসে তিনি শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের দোষগুণ নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন।

নাটক: নাটক রচনায়ও এথেন্সের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। প্রতি বছর এথেন্সে সেরা নাট্যকারদের বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হোতো। দিনের বেলা খোলা আকাশের নিচে অভিনেতারা মুখোস পরে অভিনয় করতেন। সে-যুগে দু'ধরনের গ্রীক নাটক হোতো। এক ভাগের নাম ছিল ট্রাজেডি—এতে মানুষের শোক-দুঃখ প্রাধান্য পেত; অন্য ভাগের নাম ছিল কমেডি; এগুলি ছিল ব্যঙ্গধর্মী হাসির নাটক। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে চারজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য: এসকাইলাস, সফোক্লিস, ইউপিরিডিস ও অ্যারিস্টোফেনিস।

এসকাইলাস ম্যারাথনের যুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি পারস্য অভিযান সম্বন্ধে একখানি নাটক লেখেন।

নাট্যকার সফোক্লিস প্রায় ৭১ খানি নাটক লিখেছিলেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই নাট্যকার হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লেখা সাতখানি নাটক এখনও পাওয়া যায়। তাঁর নাটকগুলির ভাব ও ভাষা অতি সুন্দর। **'আন্তিগোনে'** তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত নাটক।

ইউপিরিডিস এথেন্সবাসীদের দোষত্রুটি নিয়ে নাটক রচনা করতেন। দেশের প্রচলিত ধর্মের প্রতিও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। অ্যারিস্টোফেনিসও তাঁর নাটকের মাধ্যমে এথেন্সবাসীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেন। এমন কি, সক্রেটিসের নতুন চিন্তাধারাকে উপহাস করেও তিনি নাটকে হাস্য-রস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: এথেন্সে অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির ও প্রাসাদ তৈরি হয়েছিল। মন্দিরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল **পার্থেনন**। এটি ছিল এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অ্যাথেনার মন্দির। মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। এই মন্দিরে অ্যাথেনা দেবীর সোনার ও হাতির দাঁতের তৈরি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। **ফিডিয়াস** ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। তাঁর তৈরি দেবরাজ জিউস-এর মূর্তি সকল যুগের মানুষকেই মুগ্ধ করেছে। ক্যালিক্রেটিস এবং প্র্যাক্সিটিলিস নামে আরও দুজন শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এথেন্স নগরে অনেক সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর তৈরি হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রীসের ধর্ম ঃ প্রাচীন গ্রীকরা আমাদের মতই নানা দেব-দেবীর পূজো করত। তাদের বিশ্বাস ছিল, এসব দেব-দেবীরা থাকেন



অ্যাপোলো



হেরা



দেবী অ্যাফ্রোডাইট

অলিম্পাস পাহাড়ে। দেবতাদের রাজা ছিলেন **জিউস**। অসম্ভব রাগী দেবতা হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর পুত্র হলেন **অ্যাপোলো** এবং কন্যা হলেন **অ্যাথেনা**। অ্যাপোলো হলেন সূর্য-দেবতা। শিল্পকলা এবং গান-বাজনাতে তিনি ছিলেন পারদর্শী। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সবই ছিল তাঁর নখ-দর্পণে। তাই গ্রীকগণ ভবিষ্যৎ জানার জন্য দলে দলে তাঁর মন্দিরে যেত। অ্যাথেনা ছিলেন জ্ঞান ও যুদ্ধের দেবী। তাঁর নাম থেকেই



দেবী অ্যাথেনা

গ্রীসের বর্তমান রাজধানীর নাম হয়েছে—**এথেন্স**। গল্প আছে, অ্যাথেনার

মা ছিল না। পিতার মস্তক থেকে তাঁর জন্ম হয়। অ্যাপোলো এবং অ্যাথেনা ছাড়াও হেরা, অ্যাফ্রোডাইট প্রভৃতি ছিলেন গ্রীকদের উপাস্য দেবদেবী।

ম্যাসিডনিয়াঃ গ্রীসের উত্তরে ম্যাসিডনিয়া নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ম্যাসিডন। ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন **ফিলিপ**। ফিলিপের সময়ে এথেন্স-স্পার্টার মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলত; ফলে উভয় রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুযোগ বুঝে ফিলিপ এথেন্স এবং স্পার্টা অধিকার করে নেন।

ফিলিপের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **আলেকজান্দার** ম্যাসিডনিয়ার সিংহাসনে বসেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। আলেকজান্দার ছিলেন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। গ্রীসের বিখ্যাত পণ্ডিত **অ্যারিস্টটল** ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

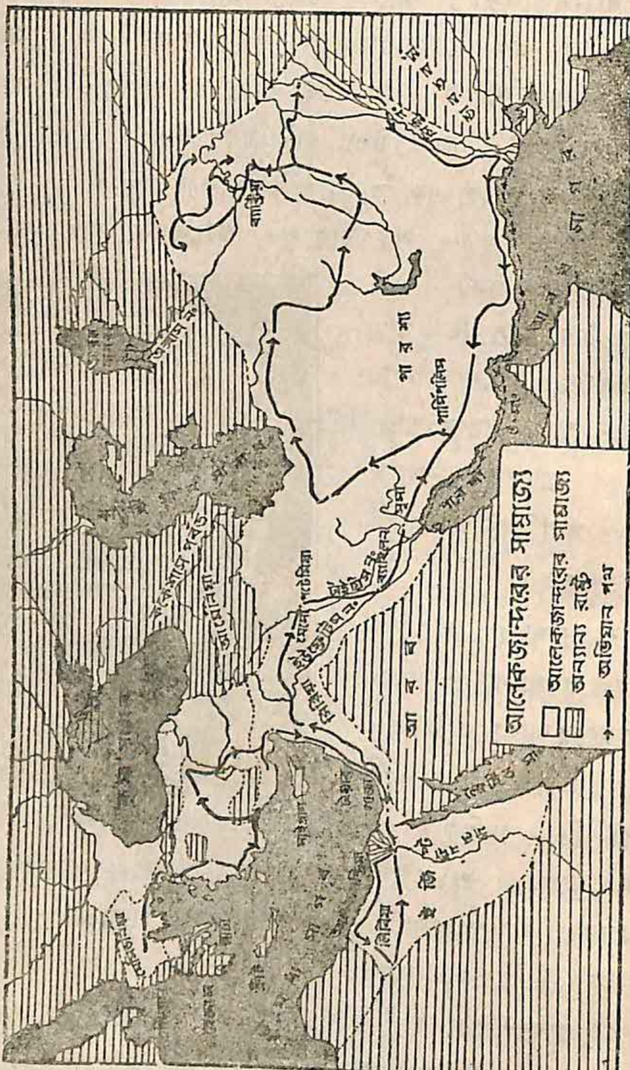


আলেকজান্দার

বাল্যকাল থেকেই আলেকজান্দারের মনে দিগ্বিজয়ের আশা জেগেছিল। পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেই তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তিনি শক্তিশালী পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করলেন। পারস্য সম্রাট তৃতীয় দরায়ুস যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। এরপর আলেকজান্দার সিডন ও টায়ার বন্দর অধিকার করে মিশরে প্রবেশ করলেন। মিশর সহজেই বিজিত হল। অতঃপর আরবেলার যুদ্ধে দরায়ুস সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। পারস্য সাম্রাজ্য জয় সম্পূর্ণ করে আলেকজান্দার আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হলেন।

ভারত অভিযানঃ এভাবে তিনি আফগানিস্থান জয় করে

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এসে পৌছলেন। এই অঞ্চলে তখন অনেকগুলি ছোট-ছোট রাজ্য ছিল। এর কোন কোনটি আলেকজান্দারকে বাধা দিলেও বেশির ভাগ রাজ্যই অতি সহজেই তাঁর বশ্যতা



স্বীকার করে নেয়। এরপর তিনি খাইবার গিরিপথ পার হয়ে এসে পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। এখানে প্রথমেই আলেকজান্দারের সামনে পড়ে তক্ষশীলা রাজ্য। প্রাচীনকালে এখানে একটি বিখ্যাত

বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। তক্ষশীলার রাজা ছিলেন অম্ভি। তিনি যুদ্ধ না করেই আলেকজান্দারের বশ্যতা স্বীকার করলেন এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি জয় করার জন্য আলেকজান্দারকে নানা ভাবে সাহায্য করতে লাগলেন।

অম্ভির রাজ্যের পরে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে ছিল পুরুর রাজ্য। পুরু ছিলেন বীর; তিনি আলেকজান্দারের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। তখন দু'পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। পুরু প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আলেকজান্দারের হাতে বন্দী হলেন। গল্প আছে, আলেকজান্দার নাকি বন্দী পুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনি আমার কাছে এখন কি রকম ব্যবহার আশা করেন?' পুরু মাথা উঁচু করে উত্তর দিলেন, 'রাজার কাছ থেকে রাজা যেমন ব্যবহার পেতে পারেন, সেই রকম ব্যবহার।' বীর আলেকজান্দার পুরুর কথায় চমৎকৃত হয়ে তাঁকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন।

পুরুর সঙ্গে যুদ্ধের পর আলেকজান্দার আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা আর বেশিদূর অগ্রসর হতে চাইল না। পুরুর মত একজন ছোট রাজাকে পরাজিত করতেই তাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তার উপর মগধের নন্দ রাজাদের শক্তির কথাও তাদের কানে পৌঁছেছিল। এসব ছাড়াও বহুদিন যুদ্ধ করে সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এই সব কারণে বিপাশা নদীর তীর থেকে আলেকজান্দার দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

দেশে ফিরবার সময় গ্রীক সৈন্যদের এক ভাগ সমুদ্রপথে যাত্রা করল। বাকি সৈন্য নিয়ে আলেকজান্দার বেলুচিস্তান ও পারস্যের মধ্য দিয়ে ব্যাবিলনে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৩ বছর।

সাম্রাজ্যের পতনঃ আলেকজান্দার মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল। তাঁর সেনাপতিরা নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে নিলেন। পারস্য ও ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পেলেন সেনাপতি সেলুকাস। কিন্তু সেলুকাস ভারতবর্ষে বেশিদিন

গ্রীকদের অধিকার রক্ষা করতে পারেন নি। ভারত থেকে গ্রীকদের বিতাড়িত করেন **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য**।

অনুশীলনী

১। গ্রীসের সভ্যতার উপরে ক্রীটের সভ্যতা কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

২। হোমার কে ? তাঁর রচিত মহাকাব্য দুটির নাম এবং ওদের কাহিনী উল্লেখ কর।

৩। হোমারীয় যুগে গ্রীসের জীবনযাত্রা কেমন ছিল ?

৪। নগর-রাষ্ট্র কি ? গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলির পরিচয় দাও।

৫। কোন্ কোন্ জায়গায় গ্রীকরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন ?

৬। এথেন্সের রাজনৈতিক জীবন কেমন ছিল তার পরিচয় দাও।

৭। এথেন্সবাসীর সামাজিক ও নাগরিক জীবন সম্বন্ধে যা জান বল।

৮। স্পার্টার নাগরিক জীবন কেমন ছিল ?

৯। কি নিয়ে এথেন্স এবং স্পার্টার মধ্যে যুদ্ধ হয় ? এই যুদ্ধের নাম কি ? যুদ্ধের ফলাফল কি হয় ?

১০। পেরিক্লিস কে ? তাঁর আমলকে এথেন্সের স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন ?

১১। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে এথেন্সের উন্নতির পরিচয় দাও।

১২। আলেকজান্দারের রাজ্যজয় ও ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও।

১৩। **নিম্নলিখিতদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ**

সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, প্লেটো, হেরোডোটাস, থুসিডিডিস, সফোক্লিস, এসকাইলাস।

১৪। **দু'-এক কথায় উত্তর দাও ঃ**

(ক) লাইকারগাস কে ?
(খ) স্পার্টার শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল ?
(গ) গ্রীক দেবদেবীদের নাম কি ?
(ঘ) সফোক্লিস কে ছিলেন ?

১৫। **সঠিক উত্তরটির পাশে '√' চিহ্ন দাও এবং ভুল উত্তরটির পাশে '×' চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) হোমার লিখিত মহাকাব্য দুটির নাম ইলিয়াড ও ওডিসি।
(খ) প্লেটো ছিলেন অ্যারিস্টটল-এর শিষ্য।
(গ) হেরোডোটাসকে ইতিহাসের জন্মদাতা বলা হয়।
(ঘ) প্লেটোর দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ ডায়ালোগ্স ও রিপাবলিক।
(ঙ) 'আন্তিগোনে' নাটকের রচয়িতা এসকাইলাস।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

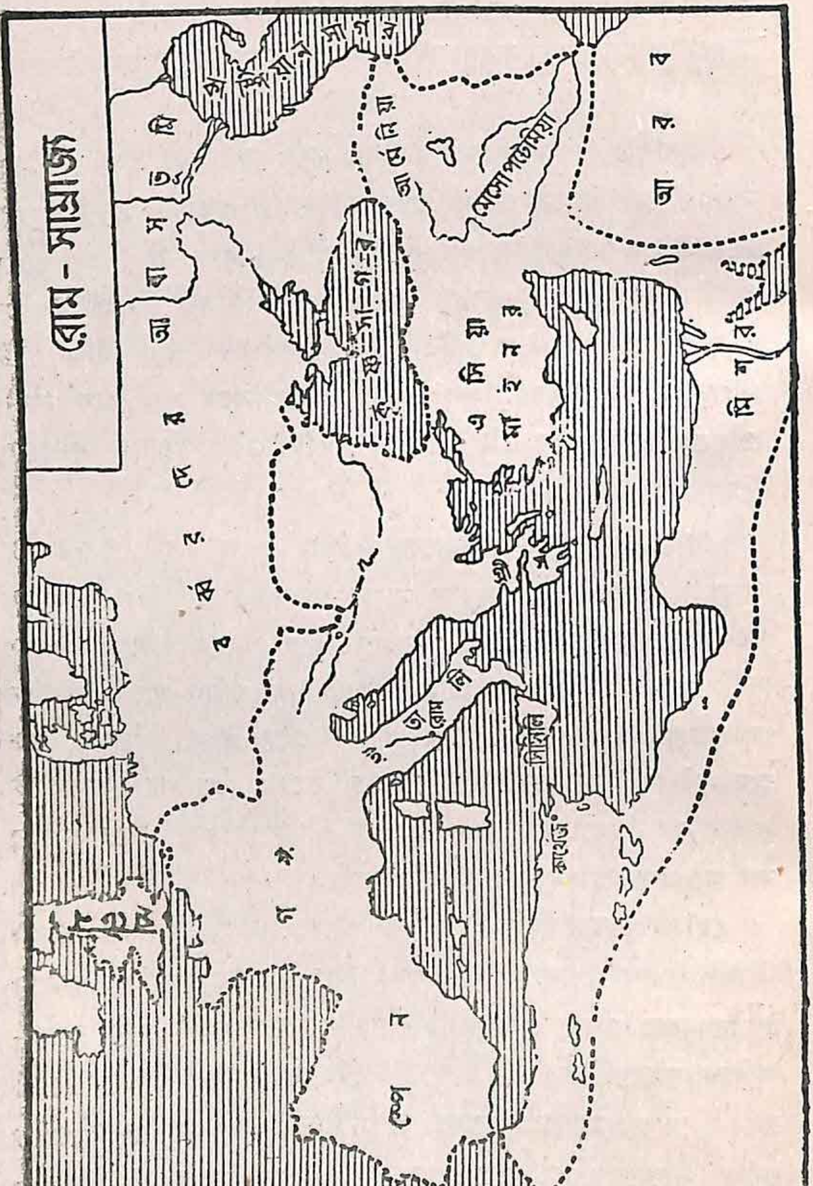
রোম

ইতালীর পশ্চিম উপকূলে টাইবার নামে একটি নদী আছে। এই নদীর বাঁকে আছে সাতটি পাহাড়। এই সাতটি পাহাড়ের একটির চূড়ায় ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির এক শাখা বসতি বিস্তার করেছিল। এরা ল্যাটিন ভাষায় কথা বলত। ক্রমে ক্রমে এই বসতি একটি শহরের আকার ধারণ করে। শহরটির নাম হয় রোম। পরে বাকি ছ'টি পাহাড়ের উপরকার বসতিও এই শহরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। গ্রীকদের পতনের পর এই রোমের অধিবাসীরাই ইউরোপে সভ্যতার বিস্তার করে।

রোমের উৎপত্তি ঃ রোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। রিমাস ও রোমুলাস নামে দুই যমজ ভাই ছিল। তাদের কাকা রাজ্যের লোভে একটি ডোঙ্গায় করে তাদের টাইবার নদীতে ভাসিয়ে দেন। পরে এক বাঘিনী শিশুদুটিকে পালন করে। একজন মেষপালক এই শিশুদুটিকে বাঘিনীর বাসা থেকে উদ্ধার করেন। বড় হয়ে দুই ভাই তাদের দুষ্ট কাকাকে হত্যা করে। এর পর একদিন দুই ভাইয়ে ঝগড়া বেধে যায় এবং রোমুলাস রিমাসকে হত্যা করে নিজের নাম অনুসারে রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করে।

রোম ও কার্থেজ ঃ ইতালির পায়ের তলায় সিসিলি দ্বীপ। সিসিলি থেকে সোজা দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পার হলেই কার্থেজ বন্দর। টায়ার বন্দর থেকে একদল ফিনিসীয় বণিক্ এখানে এসে ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করে। এর ফলে কার্থেজ খুব সমৃদ্ধশালী হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে, এমন কি স্পেন দেশে পর্যন্ত, কার্থেজের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। নৌ-বিদ্যায় ফিনিসীয়দের জুড়ি কেউ ছিল না। সেইজন্য নৌ-যুদ্ধে তাদের কাছে কেউ ঘেঁষতে পারত না।

সিসিলী দ্বীপের উপর যখন কার্থেজের আধিপত্য বিস্তৃত হল, তখন রোমানরা তা আর সহ্য করতে পারল না। ইতালিতে প্রভুত্ব করতে হলে



সিসিলির ওপরও অধিকার প্রয়োজন। সুতরাং রোম ও কার্থেজের মধ্যে যদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। রোম এবং কার্থেজের মধ্যে যে যুদ্ধ

হয়, তিনটি প্রধান পর্যায়ে উহা বিভক্ত: প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধ চলে তেইশ বছর। নৌ-শক্তিতে যদিও কার্থেজীয়রা অনেক উন্নত ছিল, তথাপি রোমানরা তাদের তৈরি জাহাজের সাহায্যে উন্নত কার্থেজীয় নৌ-বহরকে পরাজিত করেছিল। রোমান সেনাপতি রেগুলাস কার্থেজ বন্দরের কাছে স্থলযুদ্ধেও কার্থেজীয়দের পরাস্ত করেন। অবশেষে রোম ও কার্থেজের মধ্যে সন্ধি হয়। সিসিলি রোমের অধিকারে আসে। এভাবে প্রথম পিউনিক যুদ্ধ শেষ হয়।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের কুড়ি বছর পর রোম এবং কার্থেজের মধ্যে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত।

কার্থেজীয় বীর হ্যামিলকার বার্কা রোমকে শাস্তি দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তিনি স্পেন দখল করে সেখানে ঘাটি স্থাপন করলেন। তাঁর বালক পুত্র হ্যানিবলকে দিয়ে দেবতার বেদী ছুঁইয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তিনি রোমকে অবশ্যই ধ্বংস করবেন। এই শপথের কথা হ্যানিবল আজীবন মনে রেখেছিলেন। হ্যামিলকারের মৃত্যুর পর হ্যানিবল সেনাপতি হলেন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছাব্বিশ বছর। হ্যানিবল বহু সৈন্য এবং হাতি নিয়ে আল্পস পর্বত পার হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করলেন। রোমানরা সব যুদ্ধেই পরাজিত হয়। পনরো বছর ধরে হ্যানিবল ইতালিতে যুদ্ধ করে যুদ্ধে জয়লাভ করলেন, কিন্তু রোম নগরী অধিকার করতে পারলেন না। ক্রমাগত যুদ্ধ করার ফলে হ্যানিবলের সৈন্যদল দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। হ্যানিবল বার বার স্বদেশে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু কোন সাহায্য পেলেন না। এদিকে রোমান সেনাপতি সিপিও ভূমধ্যসাগর



হ্যানিবল

পার হয়ে কার্থেজ আক্রমণ করলেন। স্বদেশ রক্ষার জন্য হ্যানিবল ইতালি ছেড়ে কার্থেজে গেলেন। 'জামা' নামক স্থানে সিপিওর সঙ্গে যুদ্ধে হ্যানিবল পরাজিত হলেন। সিপিও কার্থেজ জয় করলেন এবং কার্থেজ রোমের অধীনে এল। হ্যানিবল দেশ থেকে পালিয়ে, বহু দেশ ঘুরে, শেষে বিষ পান করে আত্মহত্যা করলেন। এইভাবে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ শেষ হল।

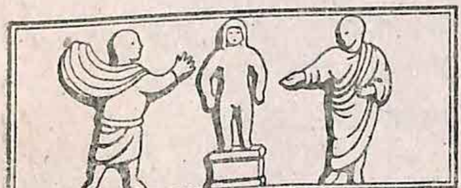
কার্থেজ কিন্তু এই পরাজয়ের কথা ভুলে যায়নি। ভেতরে ভেতরে কার্থেজ আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। রোমের লোকেরাও কার্থেজের ধ্বংস কামনা করতে লাগল। কেটো নামে রোমানদের সেনেট সভার একজন প্রবীণ সদস্য সব সময় 'কার্থেজ নিপাত যাক' বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই রোম ও কার্থেজের মধ্যে তৃতীয় বা শেষ পিউনিক যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধে কার্থেজ পরাজিত হল। বিজয়ী রোমানরা কার্থেজ নগরী পুড়িয়ে ছাই করে দিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে কার্থেজের নাম মুছে গেল।

প্রাচীন রোমের সমাজ

প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান ঃ রোমের প্রথম রাজা রোমুলাসের পর আরও কয়েকজন রাজা হন, কিন্তু তাঁরা সবাই ছিলেন অত্যাচারী। তাই রোমের লোকেরা রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই সময় রোমে দুই শ্রেণীর লোক ছিল। যারা অভিজাত ও ধনী, তাঁদের বলা হোতো **প্যাট্রিসিয়ান** এবং যারা দরিদ্র কৃষক মজুর, তাদের বলা হোতো **প্লেবিয়ান**। রাজাকে তাড়াবার পর প্যাট্রিসিয়ানরাই সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করে। এদের একটি সভা ছিল, তাকে বলা হত সেনেট। রাজ্য শাসনের সব ক্ষমতাই ছিল এই সেনেটের হাতে। দরিদ্র লোকেরা এই সেনেটের সভ্য হতে পারত না। এভাবে অভিজাত ও ধনী শ্রেণীর লোকদের শোষণের ফলে প্লেবিয়ানরা ক্রমে ক্রমে ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়ে ক্রীতদাসে রূপান্তরিত হয়।

শেষে অবস্থা এমন হয় যে, প্লেবিয়ানরা আর রোমে থাকতে চাইল না। তারা রোম ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। প্যাট্রিসিয়ানরা পড়ল মহা বিপদে, কারণ প্লেবিয়ানরা চলে গেলে দেশে চাষবাস, কাজকর্ম কারা করবে? অগত্যা তাদের রোমে রাখার জন্য নতুন আইন প্রণয়ন করে প্লেবিয়ানদের জন্য কিছু-কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করা হল। দেশ-শাসনেও তাদের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হল। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য **'ট্রিবিউন'** নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হল। প্লেবিয়ানদের নিজেদের এক পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা করা হল। প্যাট্রিসিয়ানদের সঙ্গে তাদের বিয়ে করার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হল। সরকারী পদে চাকরি করার অধিকারও লাভ করল তারা। এভাবে প্লেবিয়ানরা নীরবে সংগ্রাম করে তাদের অধিকার আদায় করল। কিন্তু তাই বলে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সদ্ভাব মোটেই স্থাপিত হয় নি; প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকত।

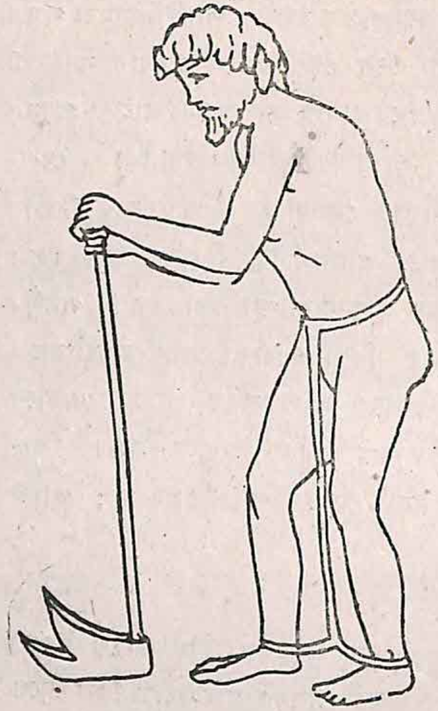
ক্রীতদাস ঃ রোমানরা পরে যখন খুব বড় হয়ে দেশে দেশে তাদের সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, তখন রোমের অধিবাসীরা তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছিল; যেমন ঃ সরকারী কর্মচারী, সৈনিক ও ক্রীতদাস। আগে কোন পেশাদার সৈনিক বা পেশাদার কর্মচারী ছিল না। যখন প্রয়োজন হোতো, নাগরিকরাই যুদ্ধ করত। সাম্রাজ্য বড় হলে স্থায়ী কর্মচারী ও পেশাদার সৈনিকের প্রয়োজন হল। যুদ্ধবন্দীদের দাস হিসাবে রাখা হোতো। বাজারেও দাস কিনতে পাওয়া যেত। কৃষি, শিল্প, এমন কি শিক্ষা-দানের কাজও করত ক্রীতদাসরা। ঘর এবং খামারের কাজও করত তারা।



জনৈক ক্রীতদাসকে বিক্রি করা হচ্ছে
[কাপুয়া যাদুঘরের চিত্র থেকে]

ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঃ রোমের লোকেরা গ্রীকদের মত অত

সভ্য ছিল না। গ্রীকরা খেলাধূলা করে ও নাটকের অভিনয় দেখে সময় কাটাত। রোমের লোকেরা মানুষে-মানুষে বা মানুষে-পশুতে লড়াই দেখে আনন্দ পেত। এক পক্ষের প্রাণ না যাওয়া পর্যন্ত লড়াই চলত। যে-সব যোদ্ধা এই লড়াই করত, তাদের বলা হোতো **গ্ল্যা ডি য়ে ট র**। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা ছিল যুদ্ধবন্দী। তাদের এই লড়াই শেখানোর জন্য কয়েকটি আখড়াও ছিল। এই গ্ল্যাডি-য়েটরদের মধ্যে একজনের নাম ছিল **স্পার্টাকাস**। সে ছিল থ্রেসের লোক, ডাকাত-দের সর্দার। প্রায় সত্তরজন গ্ল্যাডিয়েটর নিয়ে আখড়া ভেঙে সে পালিয়ে যায়। নানা কারণে এমনিতেই ক্রীতদাসরা ছিল অসন্তুষ্ট, তাই স্পার্টাকাসের সঙ্গে নানা দিক থেকে বহু ক্রীতদাস যোগ দেয়। এদের নিয়ে সে এক বিরাট বাহিনী গড়ে তোলে। দু' বছর বিদ্রোহ করে থেকে সে রোমানদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত একটা বড় যুদ্ধে রোমান সেনাপতি ক্র্যাসাসের কাছে সে হেরে যায়। হাজার হাজার ক্রীতদাসকে তখন নিষ্ঠুরভাবে মেরে ফেলা হয়।



রোমের ক্রীতদাস

জুলিয়াস সীজার ঃ কার্থেজের পতনের পর সাম্রাজ্য ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। কিন্তু এত বড় সাম্রাজ্য চালানো সোজা কথা নয়। রোমের শাসন-ব্যবস্থা ছিল সেনেটের হাতে। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য চালানোর জন্য যে বিচক্ষণতা দরকার, সেনেটের সদস্যদের তা ছিল

না। উপরন্তু রোমের সাধারণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে বড় লোকদেরই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষেরা বঞ্চিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষের অসন্তোষ বাড়তে থাকে এবং ক্রমে সাধারন-তন্ত্রের পতন ঘটে। এর পর থেকে বড় যোদ্ধারাই রোমে সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে থাকেন। প্রথমে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন ম্যারিয়াস নামক এক সেনাপতি। কিন্তু কিছুদিন পরে সুল্লা নামে আর এক সেনাপতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সুল্লাই ক্ষমতা দখল করে নেন।



জুলিয়াস সীজার

এর কিছুদিন পরে পোম্পে, ক্র্যাসাস এবং **জুলিয়াস সীজার** নামে তিন সেনাপতি একত্রে রোমের ক্ষমতা দখল করেন। প্রথম দিকে এঁদের তিনজনের মধ্যে বেশ ভাব ছিল; কিন্তু ক্র্যাসাসের মৃত্যু হলে পোম্পে এবং জুলিয়াস সীজারের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে ওঠে। শেষ পর্যন্ত জুলিয়াস সীজার জয়লাভ করেন।

সীজার ছিলেন রণনিপুণ সেনাপতি এবং সুচতুর রাজনীতিজ্ঞ; অন্য দিকে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। তাঁর বীরত্বে বর্তমান ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং ব্রিটেনের এক বিরাট অংশ রোমের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বুঝেছিলেন, এত বড় সাম্রাজ্য রক্ষা করতে গেলে রোমে একনায়কের শাসন দরকার। তাই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তিনি তাঁর ক্ষমতা বাড়িয়ে

তুললেন। সেনেট রইল বটে, কিন্তু তাঁর মতেই সেনেটকে মত দিতে হোতো। সীজারের বন্ধুরা তাঁকে সম্রাট তৈরি করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল। এতে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রোমান সেনেটেরও অনেকে খুব অসন্তুষ্ট হন। ফলে সীজারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়। ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা ছিলেন ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস। সেনেট হলেই একদিন ষড়যন্ত্রকারীরা সীজারকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে।

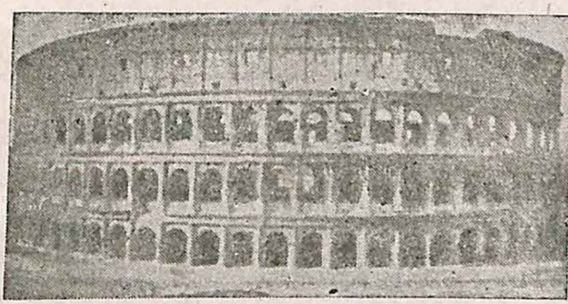
নতুন সাম্রাজ্য ঃ সীজারের মৃত্যুর পর ষড়যন্ত্রকারীরা খুব সুবিধে করতে পারে নি। সাধারণ মানুষেরা সীজারকে খুব পছন্দ করত। এই জনপ্রিয়তার জন্য ব্রুটাস এবং ক্যাসিয়াস দুজনেই পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। তখন সীজারের পালিত পুত্র অক্টোভিয়াস, তাঁর ঘনিষ্ঠ সেনাপতি মার্ক অ্যান্টনি এবং লেপিডাস নামে এক সীজার-সমর্থক মিলে এক জোট গঠন করে রোম শাসন করতে থাকেন। কিন্তু এই জোট বেশিদিন থাকে নি। কিছুদিনের মধ্যেই অ্যান্টনি ও অক্টেভিয়াসের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। অ্যান্টনি কিন্তু অক্টেভিয়াসের মত অত চতুর ছিলেন না। তিনি হেরে গিয়ে আত্মহত্যা করেন। তখন অক্টেভিয়াস হয়ে ওঠেন রাজ্যের সর্বেসর্বা। সেনেট তাঁকে সম্রাট বলে গ্রহণ করে। তখন তাঁর নাম হয় অগাস্টাস সীজার। ইংরেজি 'অগাস্ট' মাসের নাম এই 'অগাস্টাস' কথাটা থেকেই এসেছে।

অক্টেভিয়াসের আমল থেকেই শুরু হয় রোমান সাম্রাজ্যের যুগ। এই সময় শিল্প ও সাহিত্যে রোম খুব উন্নতি করেছিল। এইজন্য তাঁর সময়কে **'রোমের স্বর্ণযুগ'** বলা হয়।

অক্টেভিয়াসের পর যাঁরা সম্রাট হলেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বেশ ভাল এবং কয়েকজন ছিলেন খুব বিলাসী ও নিষ্ঠুর। মার্কাস অরেলিয়াস ছিলেন দার্শনিক সম্রাট। তিনি মোটেই বিলাসিতা পছন্দ করতেন না। আবার ক্যালিগুলা ও নীরো ছিলেন নিষ্ঠুর, বিলাসী ও খামখেয়ালী।

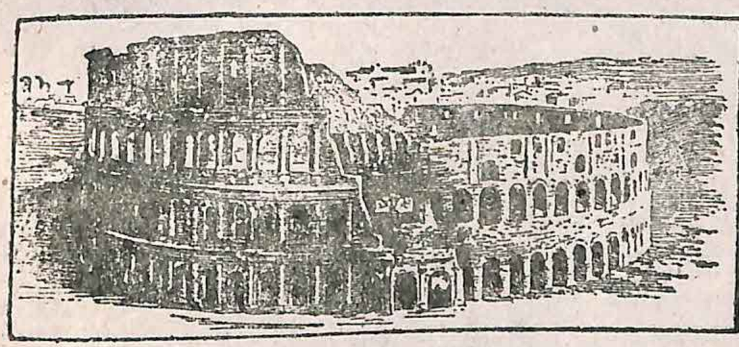
রোমের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর ঃ রোম সাম্রাজ্যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর শহর ছিল। এর মধ্যে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া এবং সিসিলির সিরাকিউজ ছিল বিখ্যাত। কিন্তু রোম নগরী ছিল সকলের সেরা।

রোমের প্রশস্ত রাজপথ, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, সুউচ্চ বিজয়স্তম্ভ ও তোরণ, 'ফোরাম' (যেখানে সেনেটের সভা বসত), বিরাট কলোসিয়াম ও অ্যাম্পিথিয়েটার প্রভৃতি ছিল সারা পৃথিবীর বিস্ময়। কলোসিয়ামে



রোমের অ্যাম্পিথিয়েটার

পঞ্চাশ হাজার লোক একসঙ্গে বসে ক্রীড়াকৌতুক দেখতে পেত। এখানে বাঘ, সিংহ, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুর সামনে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হোতো। পশুরা এসব হতভাগ্যদের ছিঁড়ে খেত। এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখে রোমানরা খুব আনন্দ পেত। এ-ছাড়া পশুশিকার এবং রথের দৌড়ের প্রতিযোগিতাও রোমানীয়রা খুব পছন্দ করত।



রোমের কলোসিয়াম

কলোসিয়াম ছাড়া অনেক বড় বড় অট্টালিকাও রোমে তৈরি হয়েছিল। এসব অট্টালিকার উপরে থাকত প্রকাণ্ড গম্বুজ। শহরের স্থানে স্থানে জনসাধারণের জন্য স্নানাগারের ব্যবস্থা ছিল। রোমে একটি বিরাট বড় স্নানাগারে ষোল শত লোক একত্রে স্নান করতে

পারত। রোমের সেনাপতিগণ যুদ্ধজয়ের পর শোভাযাত্রা করে রাজধানীতে প্রবেশ করতেন। তখন বড় বড় ফটক ও স্তম্ভ তৈরি করা হোতো। এসব স্তম্ভে অনেক লিপি ক্ষোদিত থাকত। এসব লিপি থেকে সে-সময়ের রোমের অনেক কথা জানা যায়।

রোমের শ্রেষ্ঠ অবদান হল তার আইন। আইন পড়তে গেলে এখনও প্রথমে রোমীয় আইন পড়তে হয়। সে-সময়ে রোমীয়রা সাম্রাজ্যের মধ্যে অনেক হাসপাতাল তৈরি করেছিল। **ট্যাসিটাস লিভি ও ভার্জিল** ছিলেন শ্রেষ্ঠ রোমীয় সাহিত্যিক। লিভি রোমের ইতিহাস লিখেছেন। ভার্জিল তাঁর **'ইনিড'** কাব্যে রোমের উৎপত্তির ইতিহাস লিখেছেন। **ট্যাসিটাস** ছিলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা ও ঐতিহাসিক।

রোমে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার ঃ যীশুখ্রীষ্টের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর ধর্মমত রোমান সাম্রাজ্যে প্রচার করতে লাগলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রোমান সম্রাট খ্রীষ্টানদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। খ্রীষ্টানরা রোম সম্রাটকে দেবতা বলে মানত না। সেইজন্য রোমসম্রাট খ্রীষ্টানদের উপর নানারকম অত্যাচার করতেন। কিন্তু হাজার অত্যাচারেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা দমলেন না। ধর্মের জন্য অনেক খ্রীষ্টান নির্ভীকভাবে মৃত্যুও বরণ করলেন। ক্রমে ক্রমে রোমে বহু লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় তিনশ বছর পর রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন যখন খ্রীষ্টান হলেন, তখন রোমে বিনা বাধায় খ্রীষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়ল। তারপর ক্রমে ক্রমে সারা পৃথিবীর লোক খ্রীষ্টধর্মের মহিমা জানতে পারল।

অনুশীলনী

১। রোমের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে গল্পটি প্রচলিত আছে, তা নিজের ভাষায় বল।

২। পিউনিক যুদ্ধ কাকে বলে? এই যুদ্ধ বেধেছিল কেন? তিনটি পিউনিক যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

৩। হ্যানিবল কে? তাঁর কৃতিত্বের বর্ণনা দাও।

৪। প্যাট্রিসিয়ান ও প্লেবিয়ান কাদের বলা হোতো? প্রাচীন রোমের সমাজে এদের গুরুত্ব কতটা ছিল?

৫। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে ক্রীতদাসদের অবস্থা কেমন ছিল?

৬। স্পার্টাকাস কে? কেন তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন?

৭। জুলিয়াস সীজার কে? কিভাবে তিনি ক্ষমতা দখল করেন?

৮। জুলিয়াস সীজারের পরের রোমান সম্রাট সম্বন্ধে যা জান বল। অক্টেভিয়াসের আমলকে 'রোমের স্বর্ণযুগ' বলা হয় কেন?

৯। রোমের ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের বর্ণনা দাও।

১০। রোমে খ্রীষ্টধর্মের বিস্তার কিভাবে হল?

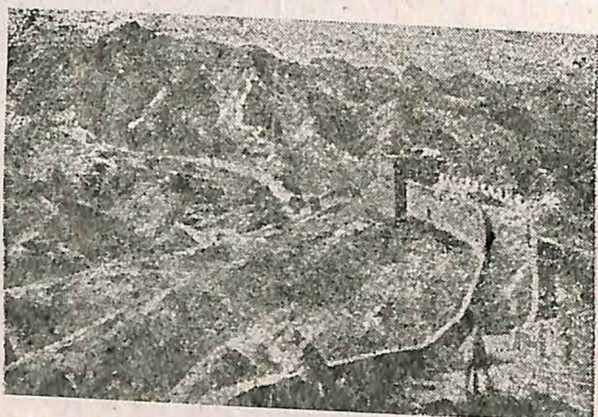
চীন

শান্ বংশ ঃ পাঁচজন পৌরাণিক সাম্রাটের রাজত্বের পর শান্ বংশের রাজত্বকাল থেকে চীনের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়। এই বংশ 'ইন্' বংশ নামেও পরিচিত। আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এঁরা বিদ্যমান ছিলেন। 'ইন্' বংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর এদের রাজধানী মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। এই স্থানটি **'ইনের ঢিপি'** নামে পরিচিত। এদের রাজধানী ছিল বর্তমান চীনের হুনান প্রদেশে। এই স্থানের মাটি খুঁড়ে ব্রোঞ্জের তৈরি নানা আসবাবপত্র এবং বাঁশের চটার উপর লেখা অনেক পুঁথি পাওয়া গেছে। এসব জিনিসের সাহায্যে আমরা প্রাচীন যুগের চীনাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারি। যে সমস্ত ব্রোঞ্জের পাত্র ও বাসন পাওয়া গেছে, সেগুলোর ওপর নানারকম কারুকার্য দেখা যায়। তাছাড়া কিছু কাছিমের খোলাও পাওয়া গেছে। তার উপর অনেক দৈববাণী লেখা আছে এবং কয়েকজন রাজার নামও আছে। তীর ও বর্শা নিয়ে শিকারের ছবি এবং কুকুর, ষাঁড় ইত্যাদি জীবজন্তুর ছবিও এতে আছে।

চৌ বংশ ঃ শান্ বংশের পর চীনে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন চৌ-বংশীয় রাজারা। অনুমান করা হয় যে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে চৌ বংশের রাজারা রাজত্ব করতেন। এই বংশের রাজা 'য়ু' দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে কিছু কিছু জমি বিতরণ করে দেন। এঁরাই হলেন জমিদার। জমিদারদের জমিতে যারা বসবাস করত, তারা জমিদারদের অনেক কাজ করে দিত। তারা জমিদারদের জ্বালানি কাঠ যোগাড় করে দিত, মাছ ধরে দিত, শিকার করে মাংস এনে দিত। জমিদাররা আবার নিয়মিত চৌ রাজাদের দরবারে আসত এবং রাজাকে তাদের জমিদারির অবস্থা সম্বন্ধে জানাত। রাজারাও পাঁচ বৎসর অন্তর দেশ ভ্রমণ করতেন। ভালো জমিদারদের

রাজা পুরস্কার দিতেন, আর দুষ্ট জমিদারদের শাস্তি দিতেন। চৌ রাজাদের শাসনকালে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টজন্মের ৫৫০ বছর আগে, চীনে দুজন জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের একজনের নাম **লাও-ৎ-সে** এবং অন্য জনের নাম **কনফুসিয়াস**। কনফুসিয়াসের লেখা ইতিহাস থেকে সেই সময়কার চীন সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা জানতে পারি।

চিন্ বংশ ঃ শোনা যায়, চৌ রাজাদের আমলে যে-সব জমিদার বা সামন্ত রাজা ছিলেন, তাদের মধ্যে **'চিন্'** নামে এক বংশ প্রাধান্য লাভ করে এবং সমস্ত দেশটিকে তারা একটি রাজার অধীনে এনে ঐক্য-বদ্ধ করে। চিন্ বংশের নাম থেকেই দেশটির নাম হয় **'চীন'** দেশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম **শি-হুয়াং-তি**। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কীর্তি হল



চীনের মহাপ্রাচীর

'চীনের মহাপ্রাচীর'। এই বিশাল প্রাচীর শান হাইক্বান থেকে শেন্সি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রায় দেড় হাজার মাইল লম্বা। হূণ প্রভৃতি বর্বর জাতির হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এই প্রাচীর তৈরি করা হয়। এই প্রাচীরের উচ্চতা প্রায় ষোল হাত এবং এর ওপর দিয়ে ছয়জন ঘোড়সওয়ার পাশাপাশি চলতে পারে। এই বিস্ময়কর প্রাচীর আজও টিঁকে আছে।

শি-হুয়াং-তি ছিলেন চিন্ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তিনি চীনের সব রাজ্য জয় করেন। এমন কি, মাঞ্চুরিয়া এবং মঙ্গোলিয়ার অংশও অধিকার করেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সারা দেশকে তিনি ছত্রিশটি ভাগে ভাগ করেন। তাঁর আমলে জলসেচের ব্যবস্থা আরও

উন্নত হয়েছিল এবং বহু রাজপথ নির্মিত হয়েছিল। এক শক্তিশালী সামরিক বাহিনীও তিনি তৈরি করেন। তবে, তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় এক সময় দেশের এক বিরাট শ্রেণী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কনফুসিয়াসের শিষ্যরা। এজন্য তাঁদের শাস্তিও ভোগ করতে হয়েছিল। প্রায় ৪৬০ জন কনফুসিয়াসপন্থী পণ্ডিতকে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেওয়া হয়। অবশ্য শি-হুয়াং-তির মৃত্যুর পর চিন্ রাজবংশ ক্ষমতাচ্যুত হয়। এর পর আসে হান্ রাজবংশ। এঁরা চিন্‌দের চেয়ে কম নির্মম ছিলেন।

কনফুসিয়াস ঃ আমাদের দেশের বুদ্ধদেব এবং চীনের কনফুসিয়াস প্রায় একই সময় জন্মগ্রহণ করেন। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীনের শানটুং প্রদেশে তাঁর জন্ম হয়। খুব ছোট বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান। তাই মাকে সাহায্য করবার জন্য ছোট বেলা থেকে তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হোতো। এত কাজ করেও তিনি নানা প্রকার বিদ্যা শিক্ষার জন্য সময় করে নিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খুব পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এবং তাঁর এক ছেলে ও দুই মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাইশ বছর বয়সে তিনি নিজের বাড়িতেই একটা পাঠশালা খোলেন এবং ছাত্ররা যার যেমন ক্ষমতা, সেইমত বেতন দিয়ে তাঁর কাছে বিদ্যাশিক্ষা করত। কনফুসিয়াস মুখে মুখে তাঁর ছাত্রদের ইতিহাস, কাব্য ও নীতি শিক্ষা দিতেন। কনফুসিয়াসের খ্যাতি আস্তে আস্তে



কনফুসিয়াস

চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর প্রায় তিন হাজার শিষ্য তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে চীন দেশের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বাহাত্তর বছর বয়সে খ্রীষ্টপূর্ব ৪৭৮ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

কনফুসিয়াস বলতেন, 'সংসার ত্যাগ করে ধর্মকর্ম করার কোন প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেই সমাজের উন্নতির চেষ্টা করতে হবে।' সাধারণ মানুষকে কতকগুলি ভাল নিয়ম মেনে সৎভাবে জীবন যাপন করতে হবে। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপদেশ হল ঃ (১) ভুল করলে তৎক্ষণাৎ তা সংশোধন করার চেষ্টা করবে। এতে লজ্জার কিছু নেই। (২) অন্যের কাছ থেকে যে ব্যবহার তুমি পেতে চাও না, সেই রকম ব্যবহার তুমি অন্যের প্রতিও কোরো না।

অনুশীলনী

১। শান্ বংশের কাহিনী সংক্ষেপে বল।

২। চৌ রাজাদের আমলে চীন কেমন ছিল? তাঁদের সময়ে কোন্ দুই জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন?

৩। 'চীন' নামটি কোথা থেকে এসেছে? কাদের আমলে চীনের মহা-প্রাচীর তৈরি হয়?

৪। শি-হুয়াং-তি কে? তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ দাও।

৫। কনফুসিয়াসের জীবনী সংক্ষেপে বল। তাঁর উপদেশ কি ছিল?

পঞ্চম অধ্যায় ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রাচীন ভারত

আর্যদের ভারতে আগমন ঃ এবার এমন একদল মানুষের কথা বলব, যারা যাযাবরের মত এদেশ-সেদেশে ঘুরে বেড়াত। এরা কৃষিকাজ এবং পশুপালন জানলেও এ পর্যন্ত স্থায়িভাবে কোথাও বাস করে নি। পণ্ডিতদের অনুমান, এরা কাস্পিয়ান সাগরের কূলে কূলে ঘুরে বেড়াত। তাঁরা এদের **ইণ্ডো-ইউরোপীয়** জাতি নামে অভিহিত করেছেন।

ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেন, 'এরা সেই সময় এমন একটি ভাষায় কথা বলত, যার থেকে পরবর্তীকালে সংস্কৃত, ইরাণীয়, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি বিখ্যাত ভাষাগুলির জন্ম হয়েছে।'

তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগের শেষভাগে এই সব ভবঘুরের দল নানা উপদলে বিভক্ত হয়ে চাষবাস ও পশুচারণ ক্ষেত্রের সন্ধানে এশিয়া ও ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় চার হাজার বছর আগে তাদের একটি উপদল ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় প্রবেশ করে। যাঁরা ভারতে এলেন, তাঁরা নিজেদের 'অরিয়' নামে পরিচয় দিতেন। 'অরিয়' কথার অর্থ কারুর মতে 'পূজনীয়', কারুর মতে 'কৃষক'। এই 'অরিয়' শব্দ থেকেই 'আর্য' কথাটির উৎপত্তি হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো সাহিত্য হল আর্যদের **বেদ**। বেদ চারটি—**ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব**। বেদগুলির মধ্যে ঋক্ বেদই সবচেয়ে পুরনো। 'বিদ্' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'—এই কথা থেকেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হয়েছে। ঋক্ বেদে আছে এক হাজার আঠাশটি মন্ত্র বা দেবদেবীর স্তুতি। ঋক্ বেদের যে মন্ত্রগুলো যজ্ঞের সময় সুর করে গান করা হোতো, সেগুলোর সমষ্টিই হল সামবেদ। যজুঃ বেদে আছে, বিভিন্ন যজ্ঞের মন্ত্র এবং নিয়ম-কানুন। অথর্ববেদে শত্রুকে মারার জন্য, অভিশাপ ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে-সব ক্রিয়াকর্ম করা হোতো, তার মন্ত্র আছে। আর্যরা মনে করতেন, বেদ কোনও মানুষের লেখা নয়, এগুলো ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। তাই বেদের আর এক নাম 'শ্রুতি'।

আর্যদের সমাজ জীবন ঃ আর্যদের মধ্যে প্রথমে কোন জাতিভেদ ছিল না। পরে অনার্যদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে এবং পেশার ভিত্তিতে ক্রমশঃ আর্যসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণের উদ্ভব হয়। ব্রাহ্মণদের হাতে থাকে যাগযজ্ঞ ও শিক্ষাদীক্ষার ভার। ক্ষত্রিয়দের হাতে থাকে রাজ্যশাসনের ভার। কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে যারা নিযুক্ত থাকে, তারা বৈশ্য নামে পরিচিত হয়। আর এই তিন শ্রেণীকে যারা সেবা করত, তারা হল শূদ্র।

আর্যদের সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের সবচেয়ে বয়সে বড় পুরুষটি হতেন পরিবারের কর্তা। আর্যদের জীবন 'চতুরাশ্রমের' নিয়মে পরিচালিত হোতো। সমাজের ওপরের তিন

শ্রেণীর ছেলেরা একটু বড় হলে পিতামাতাকে ছেড়ে গুরুগৃহে শাস্ত্র শিক্ষা করত। একে বলা হোতো ব্রহ্মচর্যাশ্রম। শিক্ষা শেষ হলে বাড়ি এসে তারা বিয়ে করে পারিবারিক জীবন যাপন করত। এই পর্যায়কে বলা হত গার্হস্থ্য আশ্রম। প্রৌঢ় বয়সে সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আর্যরা ধর্মচিন্তা করতেন। এই পর্যায়কে বলা হত বানপ্রস্থ। শেষ বয়সে বনে গিয়ে আর্যরা ঈশ্বরচিন্তা করে জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাতেন। একে বলা হত সন্ন্যাস আশ্রম।

আর্য সমাজে মেয়েদের স্থান ছিল খুব উচ্চে। ঘরের কাজকর্ম ছাড়াও তাঁরা লেখাপড়া শিখতেন। তাই সে-যুগে শাস্ত্র আলোচনা ও মন্ত্র রচনা করে অপালা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি মহিলাগণ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

আর্যদের জীবিকা ছিল মূলতঃ কৃষিকর্ম করা। তারা গরুর সাহায্যে লাঙ্গল চালিয়ে চাষ করতেন। গো-পালন এইজন্য পবিত্র কর্ম বলে বিবেচিত হোতো। গ্রামগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরাই তৈরি করে নিত। স্মৃতী বস্ত্র, পশমী বস্ত্র, মাটির পাত্র, ধাতুনির্মিত জিনিস ও কাঠের আসবাবপত্র তাঁরা তৈরি করতে পারতেন। খাদ্যের মধ্যে দুধ, ফল ও শাক-সব্জি ছিল প্রধান। তবে মাংস খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল না। সোমলতার রস ছিল আর্যদের প্রিয়। অবসর সময়টা তাঁরা মৃগয়া, পাশাখেলা, নৃত্যগীত ও রথচালনা করে কাটাতেন।

ধর্ম ঃ আর্যরা প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে বিভিন্ন দেব-দেবী হিসাবে কল্পনা করে, তাঁদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করতেন। তাঁরা আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোর দেবতা সূর্য, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা করতেন। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্র-পাঠ ও যজ্ঞ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বৈদিক আর্যদের মধ্যে মূর্তি-পূজার প্রচলন ছিল না।

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন ঃ আর্যসভ্যতার প্রথম যুগে কয়েকটি পরিবার নিয়ে গ্রাম এবং কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'বিশ,' বা '**জন**' গঠিত হোতো। বিশ বা জনের প্রধানকে বিশ্‌পতি বা রাজন্ বলা হোতো। রাজন্ বা রাজাই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। রাজা

'সভা' ও 'সমিতি' নামে জনসাধারণের দ্বারা গঠিত দুটি পরিষদের সাহায্যে রাজ্যশাসন করতেন। প্রথম দিকে প্রজারাই রাজাকে নির্বাচিত করতেন। পরে উত্তরাধিকার প্রথার প্রচলন হয়। কালক্রমে এক রাজা অন্য রাজাদের পরাজিত করে 'রাজচক্রবর্তী' বা 'সম্রাট' বলে নিজেকে ঘোষণা করতেন।

মহাকাব্য ঃ বৈদিক যুগের শেষ ভাগকে মহাকাব্যের যুগ বলা হয়। আর্যদের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত ঠিক কবে লেখা হয়, তা বলা কঠিন। আর্যদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। তারই কয়েকটি নিয়ে **ব্যাসদেব** রচনা করেন **মহাভারত**। আর রামচন্দ্রের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ নিয়ে **বাল্মীকি** লেখেন **রামায়ণ**। মহাকাব্য দুইটিতে বৈদিক যুগের ঠিক পরবর্তী কালের সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মনীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণ-মহাভারতে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, বেদের সময় যে ধরণের সমাজ ছিল, মহাকাব্যের যুগের সমাজ ছিল তার চেয়ে অনেকটা আলাদা। এই সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেব-দেবীর পুজো যেমন হোতো, তেমনি গণেশ, পার্বতী প্রভৃতি নতুন নতুন দেব-দেবীর পুজোও চালু হয়। সে সময় ক্ষত্রিয়দের মর্যাদা খুব বেড়েছিল।

এই সময়ে পাঞ্চাল, কোশল, মগধ, কাশী প্রভৃতি বড় বড় রাজ্য দেখা দেয়। সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হবার জন্য রাজারা এ সময়ে দিগ্বিজয়ে বের হতেন। বৈদিক যুগে আর্যরা গ্রামে থাকতেন, কিন্তু মহাকাব্যের যুগে বড় বড় নগরী গড়ে ওঠে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঃ বৈদিক আর্যদের ধর্ম প্রথম দিকে ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যাগযজ্ঞের রীতি জটিল হয়ে ওঠে। এর ফলে সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রভাব খুব বেড়ে যায়। ধর্ম হয়ে পড়ে প্রাণহীন। অনেক দার্শনিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি তখন বেদ-ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি থেকে ধর্ম ও নৈতিক জীবনকে রক্ষা করার জন্য নতুন ভাবে চিন্তা শুরু করেন। এই নতুন ধর্মচিন্তার নায়কদের মধ্যে প্রধান হলেন মহাবীর এবং বুদ্ধ।

মহাবীর ও জৈনধর্ম ঃ জৈনদের মত অনুসারে জৈনধর্মের প্রবর্তক হলেন চব্বিশজন তীর্থঙ্কর। প্রথম বাইশজন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথই ছিলেন জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক। তারপর মহাবীর এই ধর্মমতের অনেক উন্নতি

সাধন করেন। মহাবীরের আসল নাম **বর্ধমান**। বৈশালীর এক ক্ষত্রিয় বংশে তাঁর জন্ম হয়। বর্ধমান ত্রিশ বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বার বছর কঠোর তপস্যার পর ইন্দ্রিয় জয় করে '**জিন**' নামে পরিচিত হন। পার্শ্ব-নাথের প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল কথা ছিল: সত্যবাদিতা, চুরি না-করা, অহিংসা এবং লোভ সংবরণ করা। মহাবীর এই সব গুণের সঙ্গে যোগ করেন ব্রহ্মচর্যকে। জৈনরা বেদকে ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী বলে মনে করেন না। অহিংসাই হল তাঁদের ধর্মের মূল কথা।



মহাবীর

গৌতম বুদ্ধঃ গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় নেপালের তরাই অঞ্চলের কপিলাবস্তু নগরে। তাঁর পিতার নাম ছিল **শুদ্ধোধন**। তিনি ছিলেন শাক্য জাতির নায়ক। অনুমান করা হয়, খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৬৩ অব্দে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। গৌতমের আসল নাম **সিদ্ধার্থ**। শিশু-কালেই তাঁর মা মারা গেলে তাঁর মাসী গৌতমী তাঁকে পালন করেন। এইজন্য সিদ্ধার্থকে '**গৌতম**' বলা হয়। বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন চিন্তাশীল। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ইত্যাদির দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। পরে তাঁর পুত্র রাহুলের জন্মের কিছুদিন পরে উনত্রিশ বছর বয়সে একদিন রাতে তিনি ঘর ছেড়ে মুক্তির সন্ধানে



গৌতম বুদ্ধ

বেরিয়ে পড়েন। তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন, কিন্তু মুক্তির উপায় খুঁজে পান নাই। অবশেষে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে গয়ার নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব নামক স্থানে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় ধ্যানে বসে তিনি বোধিজ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। আশি বছর বয়সে কুশিনগরে তিনি দেহত্যাগ করেন।

বুদ্ধদেবের মতে মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখময় জীবন থেকে উদ্ধারের উপায়ঃ পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া বা নির্বাণ লাভ করা। তাঁর মতে, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন বা দারুণ ভোগবিলাস নির্বাণ লাভের পথে সমান বাধা। নির্বাণ লাভের জন্য তিনি মাঝামাঝি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে তিনি যে পথের নির্দেশ দেন, বৌদ্ধধর্মে তার নাম **'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'**। বুদ্ধদেব বেদের প্রাধান্য বা জাতিভেদ মানতেন না। বৌদ্ধধর্মের মূল কথা হলঃ **অহিংসা ও প্রেম**। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরা তাঁর ধর্মমত তিনটি পুস্তকে সঙ্কলিত করেন। এই তিনটি পুস্তকের একত্রে নাম **'ত্রিপিটক'**।

সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগঃ গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতে ষোলটি জনপদ ছিল। এগুলির মধ্যে অবন্তী, বৎস, কোশল ও মগধ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল; পরে মগধই ভারতে প্রথম সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। মগধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় হর্যাঙ্ক বংশের বিম্বিসারের রাজত্ব থেকে।

হর্যাঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন **বিম্বিসার**। তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর হর্যাঙ্ক বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে, শিশুনাগ নামে একজন রাজ-কর্মচারী সিংহাসন অধিকার করেন। শিশুনাগ বংশের পর মগধের ক্ষমতা অধিকার করেন মহাপদ্ম নন্দ। এই নন্দবংশ যখন মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন।

মৌর্যবংশঃ মহাপদ্ম নন্দের আট পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর তাঁরা একে একে রাজত্ব করেন। সর্বশেষ পুত্র ধননন্দকে পরাজিত করে কৌটিল্য নামক এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজধানী হল পাটলিপুত্র। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর বিশাল সেনাবাহিনীর সাহায্যে কয়েক বছরের মধ্যেই মগধকে এক সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

আলেকজান্দারের অন্যতম উত্তরাধিকারী সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পরে যে সন্ধি হয়, তার দ্বারা তাঁর রাজ্যসীমা আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে **মেগাস্থিনিস** নামে একজন গ্রীক দূত ভারতে এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী এবং কৌটিল্য নামক আর একজন লেখকের 'অর্থশাস্ত্র' নামক বইটি থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশাসন সম্পর্কে অনেক কথা জানা যায়। রাজ্যের সর্বেসর্বা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং। তাঁর নির্দেশেই সব কিছু পরিচালিত হোতো। মন্ত্রিপরিষদ তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতো। গুপ্তচররা দেশের সব খবর নিয়মিত সরবরাহ করতো। এরা ছাড়া রাজ্যপাল, মহাপাত্র, অধ্যক্ষ, গ্রামীণ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকর্মচারী ছিল।

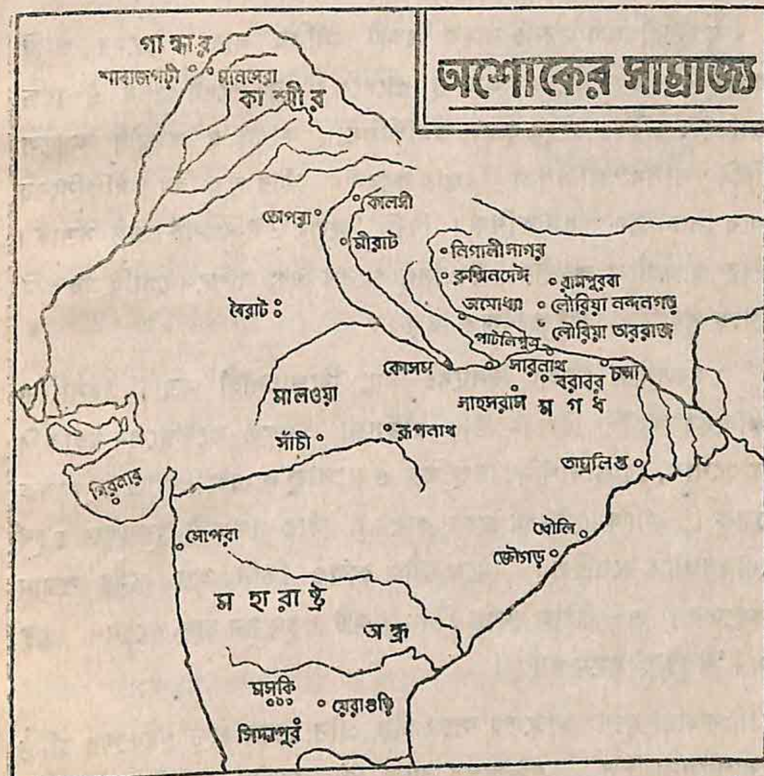
দেশ শাসনের জন্য চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। প্রদেশগুলি আবার 'বিষয়' নামে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত ছিল। রাজবংশের লোকেরা রাজ্যপাল হিসাবে কাজ করতেন, আর গ্রামীণ নামক কর্মচারীরা গ্রাম শাসন করতেন। এই সময় পাটলিপুত্র এক সুন্দর নগরীতে পরিণত হয়েছিল চন্দ্রগুপ্তের সামরিক বাহিনীতে অশ্বারোহী, পদাতিক, বহু রণহস্তী ও রথ ছিল। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার রাজা হন।



অশোক

অশোকঃ বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক সিংহাসন

লাভ করেন। অশোককে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়। অশোক রাজা হওয়ার কয়েক বছর পরে কলিঙ্গ অভিযান করেন। কলিঙ্গবাসীরা খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও হেরে যায়। যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে অশোকের হৃদয় করুণায় ভরে যায়। তিনি চিরদিনের মত যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য তিনি পাহাড়ের গায়ে এবং শিলাস্তম্ভে



বুদ্ধের বাণী খোদাই করে দেন। ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর রাজকর্মচারীদের সাহায্যে তিনি প্রজাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির চেষ্টা করেন। অহিংসাকেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ পালনীয় আদর্শ বলে মনে করতেন। তিনি প্রজাদের সুবিধার জন্য কূপ খনন ও হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন।

কেবলমাত্র নিজের রাজ্যেই নয়, ভারতের বাইরে—ব্রহ্মদেশে, মিশরে, এমন কি ইউরোপেও অশোক বৌদ্ধধর্মের বাণী প্রচারের জন্য

ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। এজন্য পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে তিনি সিংহলে পাঠান। এভাবে শান্তি ও প্রেমের বাণীর প্রচারক হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

কুষাণ যুগ ঃ মৌর্যযুগের শেষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যাকট্রিয় গ্রীক, পহ্লব এবং শক শাসকরা একে একে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। শকদের পরে কুষাণ সম্রাটগণ এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

কুষাণরা ছিল ইউ-চি নামক একটি জাতির শাখা। এদের আদি বাসস্থান ছিল চীনের কান-সু প্রদেশে। কুষাণদের প্রথম ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেন কুজুল কদফিসিস। কাবুল ও কাশ্মীর অঞ্চলে তিনি আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁর পুত্র বিম কদফিসিসের পরে সিংহাসনে বসেন **কণিষ্ক**। তিনি ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর রাজ্যসীমা কাশ্মীর থেকে সিন্ধু প্রদেশ এবং পশ্চিমে গোবি মরুভূমি থেকে পূর্ব বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কেবলমাত্র যোদ্ধা হিসাবেই নয়, বিদ্যোৎসাহী সম্রাট হিসাবেও কণিষ্কের খ্যাতি ছিল। তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন মহাকবি **অশ্বঘোষ,** বৌদ্ধ দার্শনিক **বসুমিত্র ও নাগার্জুন** এবং বিখ্যাত চিকিৎসক **চরক**। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রাজধানী পুরুষপুরে **চতুর্থ** বৌদ্ধসঙ্গীতি বসেছিল। নিজে বৌদ্ধ হলেও তিনি অন্য ধর্মের সম্মান করতেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি একটি নতুন সন চালু করেন। এই সন **'শকাব্দ'** নামে খ্যাত।

কুষাণ যুগে ভারতের সঙ্গে চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এই যুগের গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সমন্বয়ে **'গান্ধার শিল্পরীতি'** গড়ে ওঠে।

গুপ্ত যুগ ঃ কুষাণ বংশের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে এক অন্ধকার যুগ দেখা দেয়। এই সময় উত্তর ভারতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। অবশেষে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুপ্ত বংশীয় সম্রাটরা এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন **শ্রীগুপ্ত**। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ

রাজা হলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তারপর তাঁর পুত্র **সমুদ্রগুপ্ত** সিংহাসনে বসেন। তিনিই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

সিংহাসনে আরোহণ করেই সমুদ্রগুপ্ত রাজ্যবিস্তারে মন দেন। এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি থেকে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তার সম্বন্ধে কিছুটা আমরা জানতে পারি। সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দক্ষিণ ভারতের বিজিত রাজ্যগুলি তিনি সরাসরি শাসন না করে সেগুলিকে তাঁর করদ রাজ্যে পরিণত করেন।


সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। তিনিও তাঁর পিতার মতই শক্তিশালী রাজা ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত শকদের ধ্বংস করেন। চন্দ্রগুপ্তের পর কুমারগুপ্ত এবং তাঁর পর স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে বসেন। এর পর থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

বাংলার আদি কথা ঃ প্রাচীন যুগে সমগ্র বঙ্গদেশ কোনও একটি বিশিষ্ট নামে অভিহিত হোতো না। বঙ্গদেশ কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরবঙ্গে পুণ্ড্র ও বরেন্দ্র ; পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত ; দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, বঙ্গাল প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ ছিল। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। 'রামায়ণে' সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় বঙ্গের নাম উল্লিখিত আছে। 'মহাভারতে' পাণ্ডবদের সঙ্গে 'বঙ্গ' জনপদের অধিপতির যুদ্ধের বিবরণ আছে। 'প্রজ্ঞাপনা' এবং 'আচারাঙ্গ সূত্র' নামে দুটি জৈন গ্রন্থে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধগ্রন্থ 'আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প'তে গৌড়, পুণ্ড্র, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ আছে। সিংহলের প্রাচীন পালিগ্রন্থ 'দীপবংশ' এবং 'মহাবংশ'তে বঙ্গ ও রাঢ়ের নাম আছে। জাতকের কাহিনীতেও বঙ্গদেশের নাম পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের

বিবরণীতে যে পরাক্রান্ত 'গঙ্গরিডই' জাতির নাম আছে, তারা বাংলাদেশেই বাস করত। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'-ও বঙ্গদেশে উৎপন্ন নানা দ্রব্যের বর্ণনা আছে। হিউয়েন-সাঙের লেখা থেকে জানা যায় যে, পুণ্ড্রবর্ধন মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বঙ্গদেশে বহু বৌদ্ধস্তূপ ও বিহার ছিল। নাগসেনের 'মিলিন্দপঞ্হো' গ্রন্থে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের কথা আছে। কুষাণরা এ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত। গুপ্তরা বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। এলাহাবাদের স্তম্ভগাত্রে হরিষেণ-লিখিত উৎকীর্ণ লিপিতে বঙ্গদেশের নাম আছে।

প্রাচীন যুগের বাংলাদেশের কোন রাজা বা রাজবংশের কোনও-ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত শিলালিপি থেকে উত্তরবঙ্গে মৌর্য অধিকার বিস্তারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কলকাতার কাছে বসিরহাট অঞ্চলে চন্দ্রকেতুর গড়ে গুপ্তযুগের পোড়ামাটির মূর্তি ও পাত্র এবং রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ বাংলাদেশে গুপ্ত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গ রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শশাঙ্ক নামে এক ব্যক্তি গৌড়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।

বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঃ সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর নানা দেশের যোগাযোগ ছিল। মহেঞ্জোদড়োর লোকেরা মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করত বলে মনে হয়। আর্যরা বাইরে থেকে ভারতে এসেছিলেন। তারপর শক, হূণ প্রভৃতি কত জাতি ভারতে এসেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবী থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন থাকেনি। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের তিন-চারশ' বছর আগে থেকেই পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আলেকজান্দার ভারতে আসার পর এই যোগাযোগ আরও বেড়ে গিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের দরবারে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস এসেছিলেন। অশোকের ধর্মপ্রচারকরা পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে গিয়েছিলেন। ব্যাকট্রিয় গ্রীকরা ভারতবর্ষে বহু গ্রীক প্রথা চালু করেছিলেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগেই রোমের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল। মধ্য-এশিয়ার

সঙ্গেও ভারতের যোগাযোগ ছিল অতি নিবিড়। এখানকার মাটি খনন করে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ ও বুদ্ধমূর্তি—এমন কি হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। কুষাণদের আমলে মধ্য-এশিয়ার যাযাবর লোকেরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ভারতে বহু চীনা পর্যটক আসতে শুরু করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের আগেই ভারতীয় হিন্দুরা ব্রহ্মদেশের নানা স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও প্রাচীনকাল থেকে যোগাযোগ আরম্ভ হয়। এই সব যোগাযোগের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছিল। ভারতের প্রভাব বাইরে যেমন গিয়েছিল, তেমনি বাইরের প্রভাবও ভারতে এসেছিল। ব্যাকট্রিয় গ্রীকরা ভারতে অনেক গ্রীক প্রথা চালু করেছিলেন। আবার গ্রীকদের প্রভাবে ভারতের ভাস্কর্য-শিল্প খুব প্রভাবিত হয়েছিল। এর ফলে **'গান্ধার শিল্প'** নামে এক ভাস্কর্যশিল্প গড়ে ওঠে।

বৈদেশিকদের বিবরণঃ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদান হল বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ। যে সব বৈদেশিক ভ্রমণকারী প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বিবরণ রেখে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন **মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন।**

মেগাস্থিনিসের বিবরণঃ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে সেলুকাসের দূত রূপে ভারতে থাকার সময় মেগাস্থিনিস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ **'ইণ্ডিকা'** রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই সময়কার ভারতের সমাজ, শাসন-ব্যবস্থা, সাধরণ মানুষের অবস্থা ইত্যাদি বিবরণ দিয়েছেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়, মৌর্য যুগে জনসাধারণের জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। দেশে চুরি ডাকাতি খুব কম হোতো। মন্ত্রী, অমাত্য ইত্যাদি রাজকর্মচারীদের পরামর্শ নিয়ে সম্রাট রাজ্যশাসন করতেন। রাজধানী পাটলিপুত্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। পাটলিপুত্র নগরের আয়তন ছিল যোল বর্গমাইল। শহরটি ছিল প্রধানতঃ কাঠের তৈরি। রাজপ্রাসাদটি ছিল পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের চেয়েও সুন্দর।

ফা-হিয়েনঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে **ফা-হিয়েন** ভারতে

আসেন। ফা-হিয়েন গুপ্তযুগের শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য রাজারা সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। শাস্তিদানের ব্যবস্থাও খুব কঠোর ছিল না। রাজকর্মচারীদের নির্দিষ্ট হারে বেতন দেওয়া হোতো। প্রজাদের জন্য বহু ধর্মশালা ও চিকিৎসালয় ছিল। জনগণের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। জাতিভেদপ্রথা ছিল অত্যন্ত কঠোর। এই সময় ভারতীয়গণ জাহাজে করে নানা দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল তাম্রলিপ্ত। এখান থেকে সিংহল, ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য হোতো।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সংস্কৃতি ঃ প্রাচীন ভারত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে খুব উন্নতি করেছিল। মহেঞ্জোদাড়োর মানুষরা সে সময় যে ধরনের ঘরবাড়ি ও মূর্তি তৈরি করেছিল, তা দেখলে আজও আশ্চর্য হতে হয়। তাদের লিপির অর্থ উদ্ধার করা গেলে হয়ত আশ্চর্য সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যেত। আর্যরা এদেশে এসে অনার্যদের সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করেন। আর্য ও অনার্য সভ্যতা মিলে হিন্দু সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

সাহিত্য ঃ বৈদিক সাহিত্য হল ভারতের প্রাচীন সাহিত্য। এতে এত উন্নত চিন্তার পরিচয় আছে যে, আজও তার তুলনা মেলা ভার। ঐতিহাসিক কালে মৌর্যদের সময় থেকে সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', ভদ্রবাহুর 'কল্পসূত্র' ও বৌদ্ধদের 'কথাবত্থুক' মৌর্য যুগেই লেখা হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের অনেক আগেই 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' লেখা শুরু হয়। গুপ্তযুগে এই লেখা শেষ হয়। পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য'ও এই সময় রচিত হয়েছিল। সাতবাহনদের রাজত্বকালে সর্ববর্মণের 'কলাপক' এবং ইদানিং কালের 'গাথাসপ্তশতী' সম্ভবতঃ সে-সময় লেখা হয়। কুষাণদের রাজত্বকালে চরক, শুশ্রুত, নাগার্জুন প্রভৃতি লেখকগণ তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের আগে থেকে খ্রীষ্টজন্মের পরে চার শতকের মধ্যে নাগসেনের 'মিলিন্দপঞ্‌হো' গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। গর্গের জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর লেখা পুস্তক এ-সময়েই রচিত হয়। গুপ্ত-যুগে সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ ঘটে। সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং কাব্য লিখে

'কবিরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন হরিষেণ। এলাহাবাদের স্তম্ভে উৎকীর্ণ প্রশস্তিলিপি হরিষেণের-ই রচনা। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে তাঁর দরবারে **'নবরত্ন'** ছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। এঁদের মধ্যে সেরা ছিলেন **কালিদাস**। তাঁর লিখিত 'রঘুবংশম্', 'কুমারসম্ভবম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'মেঘদূতম্' প্রভৃতি অমর কাব্য। **ভাস** তাঁর 'স্বপ্নবাসবদত্তা', বিশাখদত্ত তাঁর 'মুদ্রারাক্ষস' এ-সময়েই লিখেছিলেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'-ও এই সময়ের লেখা। **ভারবি** এ সময় 'কিরাতার্জুনীয়' লিখেছিলেন। 'মহাকোষ'-রচয়িতা অমরসিংহ এবং বৌদ্ধ লেখক বসুবন্ধু ও দিগ্‌নাগও গুপ্ত যুগের লেখক। এ ছাড়া এসময় নতুন করে পুরাণ, সাহিত্য এবং নতুন স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হয়। 'নারদধর্মশাস্ত্র' এবং 'বৃহস্পতিধর্মশাস্ত্র' নামে দুটি স্মৃতিগ্রন্থ এ সময় সঙ্কলিত হয়।



অজন্তার গুহাচিত্র

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: মৌর্য যুগে বৌদ্ধধর্মের পবিত্র স্থানগুলিতে অনেক স্তূপ, শিলাস্তম্ভ ইত্যাদিও নির্মিত হয়। এগুলির শিল্পসৌন্দর্য সত্যিই বিস্ময়কর। সাঁচীস্তূপের কারুকার্য বর্তমান যুগের মানুষকেও মুগ্ধ করে। এই যুগ থেকেই গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গান্ধার শিল্প নামে এক নতুন ধারা বিকাশ লাভ করে। গান্ধার শিল্পের চরম উন্নতি হয় কুষাণ যুগে।

মৌর্যযুগের পরে গুপ্তযুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি হয়।

সারনাথের বিখ্যাত 'প্রথম: ধর্মপ্রচারে নিরত বুদ্ধ' মূর্তিটি এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যসৃষ্টি। গুপ্ত যুগে নির্মিত দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভটি এই যুগের ধাতুবিদ্যার উৎকর্ষের এক বিরাট প্রমাণ।

গুপ্ত যুগের চিত্রকলা ভারতীয় চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অজন্তার গুহাচিত্রগুলি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিক্ষা: বৈদিক যুগে গুরুগৃহে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ আমলে বৌদ্ধ বিহারগুলি ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। কৌটিল্যের সময়ে পাহাড়-পর্বতের গায়ে বাণী উৎকীর্ণ করে জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হোতো। এ ছাড়া প্রাচীন ভারতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রও গড়ে উঠেছিল। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের এক অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে, এমন কি চীন এবং গ্রীস থেকেও, পণ্ডিত এবং ছাত্রগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। এখানে বেদ, চিকিৎসা-বিদ্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হোতো। পাটলিপুত্রের দক্ষিণে নালন্দায় আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর পড়াশুনা করেন। তখন বাঙালী পণ্ডিত **শীলভদ্র** এখানের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালন্দায় প্রায় দশ হাজার ছাত্র ও শিক্ষক ছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একশত গ্রামের রাজস্ব বরাদ্দ ছিল।

বিজ্ঞান: প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানেও যথেষ্ট উন্নতি করেছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাড়িঘর তৈরি করা হোতো, তা সত্যি বিস্ময়ের। কুষাণ যুগে চরক চিকিৎসা-বিদ্যার ওপর **'চরকসংহিতা'** রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক কালে গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানে খুব উন্নতি করেছিল। গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও গভীর অনুশীলন এই যুগে হোতো। গণিত-শাস্ত্রে শূন্য এবং দশমিক আবিষ্কারের গৌরব গুপ্তযুগের। পৃথিবী যে নিজকক্ষে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে,—এই সত্য এই যুগের বিখ্যাত বিজ্ঞানী **আর্যভট্টই** প্রথম প্রচার করেন। এই যুগের আরও দুজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হলেন **বরাহমিহির** ও **ব্রহ্মগুপ্ত**। সেকালের ভারতীয়গণ

নানাপ্রকার পশুর শরীর ব্যবচ্ছেদ করে প্রাণী দেহের হাড়, স্নায়ু ও পেশী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন।

অনুশীলনী

১। আর্যরা কোথা থেকে ভারতে আসেন? কিভাবে 'আর্য' কথাটির উৎপত্তি হয়?

২। বেদ কটি? কোন্ বেদে কি কি আছে?

৩। চতুরাশ্রম কি? আর্যদের সমাজজীবন কেমন ছিল?

৪। আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় দাও।

৫। আর্যরা কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা করতেন?

৬। রামায়ণ এবং মহাভারত কে রচনা করেন? এ যুগের সমাজ কেমন ছিল?

৭। মহাবীর কে ছিলেন? তাঁর ধর্মমত কি ছিল?

৮। গৌতম বুদ্ধ কে? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বল?

৯। গৌতম বুদ্ধের ধর্মমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১০। মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর রাজ্যশাসনের বর্ণনা দাও।

১১। অশোক কে? কেন তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন? এই ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি কি করেন? কেন তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা হয়?

১২। কণিষ্ক কে? তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দাও?

১৩। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের কোন্ কোন্ রাজার রাজত্বকালে সাম্রাজ্য খুব বেড়ে যায়?

১৪। প্রাচীন বাংলার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। কোন্ কোন্ গ্রন্থ থেকে আমরা প্রাচীন বাংলার কথা জানতে পারি?

১৫। প্রাচীন যুগে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগের পরিচয় দাও।

১৬। মেগাস্থিনিস ও ফা-হিয়েন কোন্ সময়ে ভারতে আসেন? তাঁরা তাঁদের বিবরণীতে ভারত এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে কি কথা বলেছেন?

১৭। প্রাচীন যুগ থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষা ও বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতির পরিচয় দাও।

বিষয়মুখ্য প্রশ্নাবলী

১। **সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :**

(ক) ভারতের কোন্ কোন্ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা প্রাচীন যুগের জীবন যাত্রার কথা জানতে পারি ?

(খ) 'পিকিং মানব' কাদের বলে ?

(গ) আদিম মানুষ কি কি জিনিস দিয়ে ভেলা তৈরি করত ?

(ঘ) চীনের কোন্ নদীকে 'চীনের দুর্দশা' বলা হয় ?

(ঙ) সুমেরীয় পুরোহিতদের নাম কি ছিল ?

(চ) 'হিকসস্' শব্দটির অর্থ কি ?

(ছ) 'মমি' করা কাকে বলে ?

(জ) স্ফিংস-এর শরীর কেমন ছিল ?

(ঝ) পান্-কু কত বছর ধরে পৃথিবী সৃষ্টি করেন ?

(ঞ) লিপি আবিষ্কারের অন্যতম প্রধান কারণ কি ছিল ?

(ট) ব্যাবিলনীয়দের প্রধান দেবতা কে ছিলেন ?

(ঠ) যেখানে ইরাণীরা মৃতদেহ ফেলে রাখেন, তাকে কি বলে ?

(ড) ইথাকা রাজ্যের রাজা কে ছিলেন ?

(ঢ) লাইকারগাস কে ? তিনি কি আইন করেছিলেন ?

(ণ) চতুরাশ্রম কি ? কারা তা পালন করতেন ?

২। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা কি জন্য বিখ্যাত বল :**

কেটো, ট্যাসিটাস, দরায়ুস, অ্যারিস্টোফেনিস, তুতেনখামেন, য়ু, শি-হুয়াংতি, সোলোন, হেলেন, মেনিলাস, শূদ্রক, মেগাস্থিনিস, বরাহমিহির, হরিষেণ, মার্কাস অরেলিয়াস, স্পার্টাকাস, রোমুলাস।

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

(ক) — 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

(খ) গুপ্তযুগের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন — ও বরাহমিহির।

(গ) 'মালন্দপঞ্চহো' রচনা করেন —।

(ঘ) ক্রীড়াকৌতুক দেখার জন্য রোমানদের প্রকাণ্ড রঙ্গশালাগুলিকে বলা হোতো —।

(ঙ) আলেকজান্দারের পিতার নাম —।

(চ) জৈনদের তেইশতম তীর্থঙ্করের নাম —।

(ছ) ইহুদীদের ঈশ্বরের নাম —।

(জ) আর্যদের প্রাচীন গ্রন্থ হল —।

(ঝ) ইরাণীদের পোপের দেবতা —।

(ঞ) গ্রীকদের আদি কাব —।

(ট) সফোক্লিস নাটক লিখেছিলেন প্রায় — খানি।

(ঠ) এথেন্সের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম —।

(ড) কনফুসিয়াস খ্রীষ্টপূর্ব — অব্দে দেহত্যাগ করেন।

৪। নিচের উক্তিটি যে দেশের সভ্যতার পক্ষে প্রযোজ্য, সেই উক্তিটির পাশে সেই দেশের নাম লেখ :

(ক) তারা বিশ্বাস করত মানুষের মৃতদেহ যতদিন নষ্ট না হয়ে যায়, ততদিন তার আত্মা সুখে থাকে।

(খ) এই মূর্তির শরীরটা সিংহের, কিন্তু মাথাটা মানুষের।

(গ) এদেশের একজন রাজার প্রধান কীর্তি ছিল আইন-প্রণয়ন।

(ঘ) প্রচুর অর্থব্যয়ে 'শূন্যোদ্যান' তৈরি করেছিলেন একজন রাজা।

(ঙ) এখানকার ধ্বংসস্তূপে পাওয়া শীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয় নি।

(চ) এখানকার এক ধ্বংসস্তূপ থেকে বহু কচ্ছপের খোলা পাওয়া গেছে।

৫। বামদিকের উক্তির সঙ্গে ডানদিকের যে নম্বরের উক্তিটি প্রযোজ্য, সেই নম্বরটি বন্ধনীর মধ্যে লেখ :

(ক) লাইকারগাস	( )	১। আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক
(খ) ইতিহাসের জনক	( )	২। স্পার্টানদের জন্য কঠোর নিয়মের প্রণেতা
(গ) অ্যারিস্টটল ছিলেন	( )	৩। হেরোডোটাস
(ঘ) থুসিডিডিস	( )	৪। কৌটিল্য
(ঙ) সেনেট	( )	৫। বিখ্যাত রোমান সেনাপতি
(চ) সিপিও	( )	৬। মুরা
(ছ) পিউনিক যুদ্ধ	( )	৭। বিখ্যাত ঐতিহাসিক
(জ) হ্যানিবল	( )	৮। মিশরের প্রথম ফ্যারাও
(ঝ) 'অর্থশাস্ত্র' রচনা করেন	( )	৯। রোমের আইন ও শাসনসভা
(ঞ) চন্দ্রগুপ্তের মায়ের নাম	( )	১০। সবচেয়ে বড় পিরামিডের নির্মাতা
(ট) মেনেস	( )	১১। 'চিন' বংশ থেকে
(ঠ) 'চীন' নামটি এসেছে	( )	১২। কার্থেজের সেনাপতি
(ড) ভার্জিল	( )	১৩। রোমের উৎপত্তির ইতিহাস লেখেন
(ঢ) খুফু	( )	১৪। রোম ও কার্থেজের মধ্যে কলহ

মৌখিক প্রশ্নাবলী

১। 'ইতিহাস কথাটির অর্থ কি ?
২। সুমেরীয়রা লেখার জন্য কতগুলি চিহ্ন ব্যবহার করত ?
৩। নীল নদের দেবতা কে ছিলেন ?
৪। সিন্ধু উপত্যকায় লোকদের প্রধান খাদ্য কি ছিল ?
৫। মহেঞ্জোদাড়োর লোকেরা কোন্ কোন্ দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত ?
৬। পান্-কুর শরীরের কোন্ কোন্ অংশ দিয়ে পৃথিবীর কি কি জিনিস তৈরি হল ?
৭। কিভাবে পৃথিবীতে রাজবংশ দেখা দিল ?
৮। ব্যাবিলনীয়দের মহাকাব্যের নাম কি ছিল ?
৯। ইরাণী দেবতাদের পুরোহিতদের কি বলা হোতো ?
১০। বাইবেলের কোন অংশে ইহুদীদের গল্প আছে ?
১১। 'আবেস্ত' কথাটির অর্থ কি ?
১২। আরগসের রাজার নাম কি ছিল ?
১৩। গ্রীসের চারটি প্রধান নগর রাষ্ট্রের নাম কর।
১৪। 'সাধারণতন্ত্র' কাকে বলে ?
১৫। 'পেলোপোনেসিয় যুদ্ধ কাকে বলে ?
১৬। গ্রীসের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে ছিলেন ?
১৭। 'ট্রিবিউন' কাদের বলা হোতো ?
১৮। আলেকজান্দারের পর ভারতে গ্রীক অধিকৃত জায়গাগুলি কে পান ?
১৯। হ্যানিবলের পিতার নাম কি ?
২০। 'ফোরাম' কি ?
২১। মার্ক অ্যান্টনি কে ছিলেন ?
২২। মেগাস্থিনিসের লেখা গ্রন্থটির নাম কি ?
২৩। কয়েকজন বিখ্যাত আর্য নারীর নাম কর।
২৪। ছেলেবেলায় বুদ্ধদেবের নাম কি ছিল ?
২৫। কলকাতার কাছে কোন্ অঞ্চলে গুপ্তযুগের মূর্তি পাওয়া গেছে ?
২৬। ব্যাবিলনের বিখ্যাত শূন্যোদ্যান কে তৈরি করেন ?
২৭। আলেকজান্দারের পিতার নাম কি ছিল ?
২৮। কয়েকজন গ্রীক দেবতার নাম কর।
২৯। পার্থেননের মন্দির কে তৈরি করেন ?